হিরণ্যগর্ভ
দ্বাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
২৭শে আশ্বিন, ১৪২৬

Hiranyagarbha
Volume 12, No. 3
हिरण्यगर्भ
द्वादश वर्ष, तृतीय संख्या
तारिख-१५अक्टूबर,२०१९

২৭শে আশ্বিন, ১৪২৬ | 15th October, 2019

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	অর্ধনারীশ্বর	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	08
	গুরুদেব শ্রীঅভয়জীকে যেমন দেখেছি	শ্রীমতী পরিপূর্ণা দেবী	09
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	10
	পুণ্যতোয়া কাবেরী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	12
	শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	12
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	13
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	14
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	15
	গণ্ডকী নদীর কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	16
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	17
	কোথায় তোমরা চলেছ?	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	18
	পঞ্চকেদারের পথে পথে	শ্রীসৌরভ বসু	20
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	22
	সন্তোষ ও সমর্পণ	শ্রীতাপস বন্দ্যোপাধ্যায়	22
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	24
हिन्दी विभाग ः—	अर्धनारीश्वर	श्रीमती ज्योति पारेख	26
	पुण्यसलिला कावेरी	श्रीमती ज्योति पारेख	28
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	28
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	31
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	32
	पंचकेदार के पथ पर	श्रीमती ज्योति पारेख	33
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	35
	श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन	श्रीमती ज्योति पारेख	37
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	37
	ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	38
	मेरे गुरुदेव श्रीअभयजी को जैसा मैंने देखा	श्रीमती ज्योति पारेख	39
	गण्डकी नदी की कथा	श्रीमती ज्योति पारेख	39
English Section ः—	Ardhanarishwar	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	41
	Unmesh	Dr. Durgesh Chakrabarty	44
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	45
	Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	46
	Gems From the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	48
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	49

ISBN No. 978-93-80373-98-0 Cover : Sree Sree Maa Durga Creates Devi Kalika

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 7961-8745, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

কয়েকদিন পূর্বেও যে আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন, আজ তার মাঝে জেগে উঠেছে কয়েক খণ্ড ঘন নীলের ছটা — রোদে লেগেছে সোনালী আভার ঝিলিক। গ্রামবাংলার সবুজ প্রান্তর - সীমানায় মাথা দোলাচ্ছে শ্বেতশুভ্র কাশ ফুলের দল। আকাশে বাতাসে চিন্ময়ী মায়ের চরণধ্বনি - ধরণী আজ আগমণী গীতমুখরা।

প্রতি বছরের মতো এ'বছরও আমাদের আশ্রম প্রাঙ্গণে আমরা আয়োজন করেছি আনন্দময়ী মায়ের আরাধনার। ধূপ-দীপ-পুষ্প সুগন্ধে, উদাত্ত স্তোত্রবন্দনায়, আশ্রম প্রাঙ্গণ হবে আমোদিত। শ্রীশ্রীমায়ের পরম অনুকম্পায় এটি আশ্রম-উদ্‌যাপিত শারদীয়া পূজার অষ্টবিংশতি বর্ষ।

হিরণ্যগর্ভের এই শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীশ্রীমা বিধৃত করেছেন শিব-শক্তির সমন্বয় মূর্তির যোগতত্ত্ব। অর্ধনারীশ্বর মূর্তি শিব-দুর্গার একক মূর্ত্তি — এই মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে শিব ও বাম পার্শ্বে উমা বিরাজিত। সৃষ্টিতত্ত্বের আদি স্বরূপে উপনীত হলে উপলব্ধ হয় চৈতন্যময় বিরাট পুরুষ নির্গুণ-ব্রহ্ম ও তৎস্বভাব অর্থাৎ ত্রয়ীগুণাত্মক, ব্রহ্ম-অভিন্না, পরাসম্বিতময়ী, আদ্যা মহাশক্তির সমরস্যতা। এই পরমাপ্রকৃতি মহাশক্তি, পরমপুরুষকে স্বগুণে-নির্গুণে প্রকটিত করে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মাধ্যমে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করেন। এই মাতৃকাশক্তি তাই প্রকটিত সৃষ্টির মূল। শারদীয়া দুর্গামাতৃকার আরাধনায় সত্ত্বঃ-রজঃ-তমঃ — এই ত্রিগুণ-অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, লক্ষ্মী ও পার্বতীর আরাধনার মাধ্যমে আমরা শিব ও শক্তির সমরস্য আদিগুণাত্মক সেই অর্ধনারীশ্বর রূপের আরাধনাতেই ব্রতী হই।

আজ শারদীয়া নবরাত্রির পুণ্যলগ্নে হিরণ্যগর্ভের এই শারদীয়া সংখ্যাটি শ্রীশ্রীমাতৃচরণে নিবেদন করে আমরা ধন্য হলাম। আজ সুপ্রভাতে সকল গুরুভ্রাতা-ভগিনীগণের কণ্ঠে মন্দ্রিত হউক মাতৃবন্দনার ভাবগম্ভীর অভিবন্দনা।

— জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দিণী রম্যকপর্দিণী শৈলসুতে —

Come autumn, and we can see the streaks of blue amidst the dark skies. The plumes of Kash flower, dancing their heads in the gentle breeze in the verdant plains of Bengal, herald the advent of the festive season. The very feeling of holy vibrations in the air indicates that we are at the door step of Durga Puja and the autumnal Navaratri festival. Like every other year, we are gearing up to worship Goddess Durga at our Ashram premises. By the blessings of Sree Sree Maa, this year we would be celebrating the twenty eighth year of Puja at our Ashram.

In this Sharadiya edition of "Hiranyagarbha", Sree Sree Maa has expounded the spiritual significance of "Ardhanarishwara" tatwa. It is the unified form of Shiva and Shakti with Shiva on the right and Parvati on the left of the idol. When a yogi aligns himself with the very principle of Creation ("Sristitatwa"), he can realize the equivalence between Param Brahman, the purest conscience, and Adya Mahashakti, the supreme omnipresent Mother Goddess, the consort of Param Brahman. She is the very manifestation of the entire conceivable universe, the fountain of the three basic traits of Sattwa, Rajas and Tamas, and controls the eternal cycle of creation, governance and abolition. The combined worship of Goddess Saraswati, Lakshmi and Parvati during the Navaratri, is fundamentally a spiritual homage to the "Ardhanarishwara" tatwa.

On the auspicious occasion of Navaratri, we feel ourselves blessed to offer our humble homage and this edition of "Hiranyagarbha" to the golden feet of Parama Prakriti Sree Sree Maa. Let the auspicious tune of conches and resonant rhythm of hymns rise in the air to herald the advent of Mother Goddess on this mortal world.

"**Jaya jaya hey Mahishasuramardini, ramya-kapardini shailasutey**"

অর্ধনারীশ্বর

—পরমব্রহ্ম স্বরূপের এক অদ্ভুত প্রকাশ—

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

অর্ধনারীশ্বর শিব ও দুর্গার একক মূর্তি। এই মূর্তিতে ভগবান শিব অর্ধভাগে নারী ও অপর ভাগে নর। শিব ও দুর্গার মিলমিশ্রণ সম্মিলিত এই মূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায় ত্রিনেত্র, চতুর্ভূজ, হস্তে পাশ, রক্তকমল, নর কপাল ও শূল। লিঙ্গপুরাণে আছে, কল্পান্তরে সৃষ্টির তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে কিছুই সৃষ্টি করিতে পারিতেছিলেন না। তখন নিজের উপরই ব্রহ্মার ক্রোধভাব হইল এবং সেই ক্রোধাবিষ্টভাবে তাঁহার চোখে জল নির্গত হইল। সেই চোখের জল হইতেই হঠাৎ জন্ম হইল নানান ভূত-প্রেতগণের। প্রথম সৃষ্টির মধ্যে ভূতপ্রেতের সমাহার দর্শনে তখন ব্রহ্মার মনে খুবই কষ্ট হয়। ইহাতে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন। পরন্তু প্রাণত্যাগের ক্ষণেই ব্রহ্মা প্রজাপতির মুখ হইতে প্রাণময় রুদ্রের আবির্ভাব হয়। সেই রুদ্রশিবের প্রকাশ মুর্তিটিই ছিল 'অর্ধনারীশ্বর' রূপের। সেই মূর্তি বিভাগ করিয়াই তাঁহার একাংশ হইতে উমা মহেশ্বরীকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন রুদ্রশিব।

সৃষ্টিতত্ত্বের আদিস্বরূপে উপনীত হইলে দেখাযায় 'ব্রহ্ম' বা 'পুরুষ' সত্তাই ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত বিরাট আত্মা। আর 'শক্তি' আদ্যারূপা 'মহাপ্রকৃতি' বা ব্রহ্মের স্বভাব, ত্রয়ীগুণাত্মক সর্বব্যাপী মহাতরঙ্গযুক্ত পরাসম্বিৎময়ী মহাশক্তিময়ী অখণ্ড মণ্ডলাকার মহাপ্রকাশরূপ ইচ্ছা। পরমা প্রকৃতি স্বরূপা আদ্যা মহাশক্তি পরম পুরুষকে সগুণে ও নির্গুণে প্রকটিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকার্য্য পরিচালন করিতেছেন। সেই স্বয়ংক্রিয় নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপই 'মহাকাল' এবং শক্তিরূপা নির্গুণা মহাশক্তিই 'মহাকালী' ত্রিকালকে প্রকটিত করিয়া থাকেন। সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত ব্রহ্মকর্তৃক বিরাট মন হইতে অতিসূক্ষ্মা, নির্গুণা, ঈশ্বরের সহিত অভিন্না, নিত্যা, আদ্যা পরমাশক্তি প্রকটিতা হইলেন। সেই পরমাশক্তির সহিত ব্রহ্মা হৃদয়ে ভগবান মহাদেবের ধ্যানকরতঃ তপস্যা করিলেন এবং যোগযুক্ত ব্রহ্মার তীব্র তপস্যায় পিতৃসত্তা অচিরকাল মধ্যেই সন্তুষ্ট হইলেন। ইহার পর মহাদেব অর্ধনারীশ্বর রূপে সগুণে ব্রহ্মার নিকট প্রকটিতা হইলেন। ঐ 'অর্ধনারীশ্বর' স্বরূপই 'শিব ও শক্তি' সত্তার সাধন মার্গের মোক্ষ বা চরম অবস্থার পরিণতি। 'শিব ও শক্তি' সত্তার অদ্বৈত স্থিতি হইল 'স্বভাবসিদ্ধযোগ' তপপ্রথা। প্রকৃতপক্ষে শক্তি ও শক্তিমান তত্ত্বের মধ্যে অভিন্নতা ও সমতা এবং একে অপরের সম্পূরকতা প্রকট করিবার জন্যেই শ্রীভগবান ঐ অর্ধনারীশ্বর চেতনবোধির ভূমিতে তাঁহার অর্ধনারীশ্বর রূপকে ব্যক্ত করিয়াছেন।

পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী এক সময়ে দেবী পার্বতী শিবের হৃদয়ে নিজ দেহের ছায়া দেখিয়া ভাবিলেন যে অন্য কোনও রমণী তাঁহার স্বামীর হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। ইহা দর্শনে গৌরী চরম কুপিত হইয়া উঠিলে তখন শিব তাঁহাকে প্রকৃত সত্য বিভিন্নভাবে বুঝাইলেন। শেষে দেবীর ভ্রান্তি দূর হইলে তখন লজ্জা বোধ দেবীর হৃদয়ে জুড়িয়া বসিল। স্বাভিমানে দেবী শিবকে বলিলেন —''আমার ছায়াও যেমন নিরন্তর তোমার শরীরে অবস্থান করে, আমি চাই যে আমার আসল সত্তাযুক্ত শরীরটাও তোমার শরীরের মধ্যে অবস্থান করুক। আমার প্রকৃত শরীরের সর্বাংশ আপনি প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া স্পর্শ করুন; এইরূপ যাহাতে হয় তাহাই করুন।'' তখন শিব বলিলেন, ''তাহাই হউক। দেবী তুমি আমার অর্ধেক শরীর গ্রহণ করো অথবা তোমার অর্ধেক শরীর আমাকে দাও। আমার অর্ধেক দেহ হোক নারী আর অর্ধেক হোক পুরুষ। তুমি যদি তোমার শরীর দুই অর্ধভাগে ভাগ করিতে পারো, তাহা

হইলে আমার শরীর মধ্যে তোমার সত্তাদেহ অর্ধেক হরণ করিয়া লইব আমি।'' দেবী পার্বতী বলিলেন —''আমি দুই শরীর এক করিতে চাই। আপনি যদি আমার শরীরের অর্ধ হরণ করেন, তবে আমিও আপনার শরীরের অর্ধেক হরণ করিতে চাই।'' শিব তখন স্বীকার করিয়া লইলেন শিবানীর কথা। দুইজনে দুইজনের অভিন্ন সত্তায় শব্দ ও অর্থের মত তখন পরমেশ্বর শিব শিবানীর নারী শরীরের অর্ধেক হরণ করিয়া 'অর্ধনারীশ্বর' হইলেন।

মৎস পুরাণে অর্ধনারীশ্বর প্রতিমার বর্ণনা রহিয়াছে। প্রতিমার অর্ধাংশ ঈশ-শিবের মূর্তিতে বালচন্দ্রের কলা সংযুক্ত জটাভার আর অন্য অর্ধে উমার মূর্তিতে সীঁথির চিহ্ন এবং তিলক। এই মূর্তির দক্ষিণ কর্ণে নাগরাজ বাসুকি, বামকর্ণে উমার অর্ধে, কর্ণে কুণ্ডল রহিয়াছে। দক্ষিণার্ধে শিবের হস্তে আছে কপাল অথবা ত্রিশূল, বামার্ধে পার্বতীর হস্তে রহিয়াছে পদ্মফুল। কেয়ূর এবং বলয় দিয়া বিভূষিত বামার্ধের বাম বাহু আর নাগ উপবীত যথাস্থানে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। বামার্ধে পীন স্তনভার, এরই অধমাঙ্গে সুগঠিত নিতম্ব। দক্ষিণে শিবার্ধে ব্যাঘ্রচর্মাবৃত লিঙ্গ ঊর্ধ্বগ অবস্থায় রহিয়াছে। বামভাগে রত্নসমন্বিত লম্বমান কটিসূত্র, দক্ষিণ ভাগ ভুজঙ্গবেষ্টিত। মহাদেবের দক্ষিণ পদ পদ্মের উপরে আসীন আর বামে, একটু উপরে দেবী পার্বতীর নূপুর এবং রত্নভূষিত পদ অবস্থান করে। সমস্ত অঙ্গুলিগুলিতে অঙ্গুরীয় থাকিবে আর দেবী পদ হইবে আলতায় রঞ্জিত। — এই হইল অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।

''নীল প্রবাল রুচিরং বিলসৎত্রিনেত্রং
পাশারুনোৎপল-কপাল-ত্রিশূল-হস্তম্।
অর্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্ত ভূষং
বালেন্দুবদ্ধ মুকুটং প্রণমামি রূপম্।।''

ইতি—শারদাতিলক তন্ত্র

মূর্তি উপাসনা, হিন্দুধর্মশাস্ত্রে সগুণ বিগ্রহের উপাসনা। 'সগুণ' শব্দের মধ্যে শাশ্বত সনাতন ভাবটি রহিয়াছে। শাস্ত্রসম্মত পূজিত সব মূর্তি মধ্যেই অন্তর্নিহিত যোগতত্ত্ব সমাবেশিত থাকে। তাই মূর্তি মধ্যে থাকে সৃষ্টিতত্ত্বের বোধচেতনার স্তরের প্রকটরূপ। ঐ সত্য প্রতীক স্বরূপ বিগ্রহাদিগুলির সাধন রহস্য হইল গুপ্ত ব্যাপার। শরীর মধ্যস্থ তন্ত্রীগুলি যেমন বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, যেমন দেহাভ্যন্তরস্থ তন্ত্রীমধ্যে বৈদ্যুতিক বায়ুরূপী প্রাণের প্রবাহও বাহির হইতে বুঝিতে পারা যায় না, তেমন তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্বগুলিও অতি নিগুঢ় ও উপলব্ধি সাপেক্ষ। তন্ত্র যোগে সমগ্র সৃষ্টিতত্ত্বকে যিনি জ্ঞাত হন তিনি স্বয়ং শিব। সেই শিবই সকল তন্ত্রশাস্ত্রের প্রণেতা। তন্ত্রে আগম-নিগম যোগশাস্ত্র হর ও পার্বতীকে লইয়াই গঠিত। মূর্তি হল বোধচেতনার এক একটি প্রতীক স্বরূপ। সেই প্রতীকরূপী প্রতিবিম্বকে অবলম্বন করিয়া সাধকযোগী যোগযুক্ত অবস্থায় বিম্বে পৌঁছান। উপরিউক্ত ভগবান শিব ও পার্বতীর লীলায়নের মাধ্যমে যে অর্ধনারীশ্বর মূর্তির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা যোগমার্গের এক বিশেষ অবস্থাকে প্রকাশ করিয়া থাকে। শিবসত্তা ও শক্তিসত্তার যোগযুক্ত সাধন এই অর্ধনারীশ্বর স্তর হইতেই আরম্ভ হয়। সহস্রারের উপরিভাগে ব্যোম মণ্ডলে মণিপুর পদ্মের মত একটি দশদল কমলের আবির্ভাব হয়। সেই কমল কোটি সূর্য্য ও চন্দ্রের জ্যোতি দ্বারা আপ্লুত। সেই কমলের কর্ণিকায় কমলালেবুর কোয়ার মত ওতঃপ্রোত ভাবে দুটি মুখোমুখি যুক্তাবস্থায় আসীন অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়। সেটিই হইল 'অর্ধনারীশ্বর' বোধচেতনার প্রকাশময় দর্শন। ইহা যোগমার্গের অষ্টম ভূমি বলিয়া চিহ্নিত। এই ভূমি হইতেই শিবসত্তা ও শক্তিসত্তার সমরস্যতা বা সাম্য প্রাপ্ত হইতে থাকে। যোগের পথে দ্বৈত সত্তা এইখানেই অদ্বৈত স্থিতিপ্রাপ্ত হন — ঠিক যেন একটি চণকদানার ভিতরে দুটি ভাগ। এ অবস্থা পরিপক্ক হইতে হইতে অবশেষে মিলমিশ্রণের স্তরে উপনীত হইয়া শিব ও শক্তিসত্তাদ্বয় শাশ্বত পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতিরূপী শুদ্ধ সত্ত্বোর্জিত সত্তায় অদ্বৈত স্থিতিতে নিত্য অবস্থায় আসীন হন।

দ্বৈতাদ্বৈত মহাভাব সম্বোধি, একমেবাদ্বিতীয়ম্ চৈতন্য সমাধি
অস্তিত্বের বোধোদয় নামরূপ উপাধি, 'অভেদ' জ্ঞানোদয় সে যে মোক্ষ প্রাপ্তি।।—ইং ১০/৫/৯৬

দ্বৈতভাবের সাধনা এবং অদ্বৈতভাবের সাধনা সমরস্যতা লাভ করিলে সম্বোধিতে মহাভাবের উদয় হয়। সে অবস্থায় একমেবাদ্বিতীয়ম্ ভাব আসে এবং চৈতন্য সমাধি অবস্থা লাভ হয়। ঠিক যেমন হয়েছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের সম্মেলনে সচল সমাধি অবস্থায় অস্তিত্ববোধের অনুভবে যে ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয়, যেমন শিব ও শক্তি তত্ত্ব একমেবাদ্বিতীয়ম্ তত্ত্ব, সেই অবস্থাই মোক্ষের অবস্থা বা মোক্ষলাভ। **—শ্রীশ্রীমা রচিত সৃজা পুস্তক হইতে উদ্ধৃত**

আধ্যাত্মিক প্রশ্নোত্তরী

(বুদ্ধ পূর্ণিমা, ২০১৯)

১) 'ঋষি' কাকে বলে? কখন যোগী সাধক 'ঋষি' অবস্থা প্রাপ্ত হন? 'ঋষি' অবস্থায় যোগীর কি হয়?

উঃ — আকাশমার্গে যিনি বিচরণ করতে সক্ষম, যাঁর চিত্ত সর্বদাই আকাশ দর্শন করে, তিনিই হলেন 'ঋষি'। যখন যোগীসাধক কেবলী প্রাণায়াম সিদ্ধ হন তখন তিনি 'ঋষি' অবস্থায় উপনীত হন।

কেবলী প্রাণায়াম সিদ্ধ যোগী 'ঋষি' অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে সর্বদা ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করে ঋতজ্ঞানে আপন ঘট পূর্ণ করে ঋতম্বর হয়ে যান। ঋষি সৃষ্টি রহস্যের সকল বিষয় জ্ঞান করতে সক্ষম হন। ঋষি অবস্থায় আসীন যোগী সমাধিযোগে ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হন।

২) সমাধিপাদে উপনীত হতে হলে যোগীকে তিনটি অবস্থা পালন করতে হয়, সে তিনটি অবস্থা কি কি?

উঃ — সামধিপাদে আসীন হবার জন্যে তিনটি অবস্থা হল মনের সংযম ও অন্তর্মুখীনতা, নিরবচ্ছিন্ন মৌনতা (স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনায় অবস্থান করা কালীন) এবং আসনে সমাসীন হয়ে নিরন্তর ধ্যান।

৩) কখন যোগী 'সত্য প্রতিষ্ঠা' লাভ করেন?

উঃ — স্থিতপ্রজ্ঞ যোগী লয়যোগে সমাধিতেই প্রকৃত 'সত্য প্রতিষ্ঠা' লাভ করেন।

৪) 'চিন্তা' কোথা হতে উদয় হয়? আমাদের মনের চিন্তার তরঙ্গকে কি করে স্তব্ধ করা যায়?

উঃ — 'চিন্তা' আত্মশক্তি হতে প্রবুদ্ধ হয়। আমাদের মনের চিন্তার মূল নিহিত আছে হংসরূপী শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুলোম-বিলোমে। তাই প্রথমে যোগীকে শ্বাসের সংযম করে, শ্বাসকে সংবর্ধিত করে, শ্বাসের অনুলোম-বিলোম বা পূরক ও রেচকের সমতা করে নিতে হবে। তৎপরে শ্বাসের ঘর্ষণে সূক্ষ্মরূপে আলোকময় মেরুদণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং সেইখানে বৈদ্যুতিক শক্তির উদয় হয় যার ফলে সত্তায় অন্তশ্চেতনার জাগরণ হয়। প্রাণায়াম সাধনায় সুষুম্নামার্গে আকাশতত্ত্বে মনকে স্থির করতঃ, স্থির শ্বাস অবলম্বন করে যোগী যখন নিশ্চল ধ্যানে উপনীত হন, তখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যোগীর সত্তায় চিন্তার সব তরঙ্গই স্তব্ধ হয়ে যায়।

৫) চিত্তের একাগ্রতা লাভ হয় কি করে?

উঃ — মনের সঙ্কল্প-বিকল্প নষ্ট না হলে চিত্তের একাগ্রতা হয় না; সর্বদা ভগবানের স্মরণ-মনন নিধিধ্যাসনই একাগ্রতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়।

৬) 'অবধূত' কাকে বলে? পতঞ্জলিদেব কার কাছে অষ্টাঙ্গযোগ প্রাপ্ত হন?

উঃ — জীবন্মুক্ত জ্ঞানীকে 'অবধূত' বলা হয়। পতঞ্জলিদেব দত্তাত্রেয় ভগবানের নিকট অষ্টাঙ্গযোগ প্রাপ্ত হন।

৭) হর-পার্বতী কোন পর্বতে তপস্যাকালে নর্মদা নদীর আবির্ভাব হয়?

উঃ — হর-পার্বতী 'ঋক্ষ পর্বতে' তপস্যাকালে নর্মদা নদীর আবির্ভাব হয়।

৮) 'বসুমতী' কার নাম? কেন তাঁর নাম হয় 'বসুমতী'?

উঃ — 'বসুমতী' পৃথিবীর নাম। সুবর্ণ অগ্নির তেজে উৎপন্ন হয়েছিলেন বলে অগ্নির নাম হয় 'হিরণ্যরেতাঃ'। দেবী বসুধা ঐ সুবর্ণতেজ ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় 'বসুমতী'।

৯) 'বুদ্ধি' কাকে বলে?

উঃ — অন্তঃকরণের যে শক্তিবলে যে কোন বিষয়কে সংশয়হীনভাবে উপলব্ধি করা যায়, সেটাই 'বুদ্ধি' নামে পরিচিত।

১০) ভগবান কপিলের পিতা ও মাতার নাম কি? কোন নদীতীরে কপিলের পিতা তপস্যা করেন? কপিলের স্ত্রীর নাম কি ছিল?

উঃ — ভগবান কপিলের পিতা হলেন ব্রহ্মাপুত্র 'কর্দ্দম' প্রজাপতি এবং মাতা হলেন স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা 'দেবহুতি'। 'সরস্বতী' নদীর তীরে কপিলের পিতা তপস্যা করেন। 'ধৃতি' নামক ঋষিকন্যার সঙ্গে কপিলের বিবাহ হয়।

বিজ্ঞপ্তি

Library-র পুস্তকাবলী রক্ষণাবেক্ষণার্থে সদস্যদের Library-র বার্ষিক চাঁদা (১০০/- টাকা) ৩১শে জানুয়ারীর (২০২০) মধ্যে জমা করতে হবে।

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(১১)

ভূতনাথবাবুর বাটী ত্যাগ, পৈতৃক ব্যবসা, স্যার হাবার্ট হোমউড ও ধর্ম্মকথা *—পূর্ব প্রকাশিতের পর...*

ঐ সময়ে মাণিকলাল লাউডন পার্কে নির্জনে একাকী একটি বেঞ্চে প্রায়ই উপবিষ্ট থাকিতেন। উদ্দেশ্য মাত্র গুরুচিন্তা। লাউডন পার্ক অঞ্চলটি তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীভূত পদস্থ ইংরাজদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। পার্কের সন্নিকটে 'গলষ্টোন ম্যানসন্'। ঐ ম্যানসনে তৎকালীন কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার হার্বার্ট হোমউড সস্ত্রীক থাকিতেন। ঐ মহাজ্ঞানী বিচারক ও তাঁহার পত্নী হিন্দুধর্মের মূল তথ্যগুলির সহিত তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের সমন্বয় সাধনে অতীব ব্যাকুল ছিলেন। হিন্দুধর্মের পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের সহিত বাইবেলের সূক্ষ্মসূত্রগুলির সমন্বয় সাধন কাহারো দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব কিনা, এই চিন্তা হার্বার্ট দম্পতিকে ব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু প্রজ্ঞাবান হোমউড্ সাহেব অন্তরস্থ এই সমস্যার সমাধান কল্পে কোন পণ্ডিতপ্রবর বা জাগতিক বিদ্বান ব্যক্তির শরণাপন্ন না হইয়া ঐকান্তিকভাবে ও সর্বান্তকরণে ঈশ্বরের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইতেন কোথায় সেই সত্যদ্রষ্টা যিনি তাঁহাদের অন্তরস্থ সমস্যার প্রকৃত নিরাকরণ করিতে সমর্থ। ধ্যানে তাঁহাদের প্রতীতি জন্মায় যে শীঘ্রই তাঁহাদের নিকটেই দৃষ্টিপথে কোন দৈবসত্তাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁহারা পাইবেন। সেই বিশ্বাসের উপর একান্ত ভাবে নির্ভর করিয়া তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী একযোগে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁহাদের বাটীর চতুষ্পার্শে দৃষ্টিপাত করিতেন। এমনই এক শীতের দিন, সন ১৯১২। মাণিকলাল লাউডন পার্কে বসিয়া একান্তভাবে গুরুচিন্তায় নিমগ্ন, এমন সময় লাল চাপকান ও নানাবর্ণের জরিযুক্ত পোষাকে সজ্জিত হইয়া দুইজন দারোয়ান মাণিকলালের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদের কটিদেশে একটি করিয়া ক্ষুদ্র কৃপাণ। মাণিকলালকে উদ্দেশ্য করিয়া তাহারা একযোগে বলিল, ''সাব বোলাতা হ্যায়, আইয়ে।'' কোন সাহেব, কি বৃত্তান্ত কিছুই তাহারা ব্যক্ত করিতেছে না। ভীতি বিহ্বল মাণিকলাল মুহূর্তের জন্য চিন্তা করিলেন যে এই পার্ক — যাহা সাহেবদের ভ্রমণ ও চিত্ত বিনোদনের স্থান, সেখানে তাহার মত একজন কালা আদমীর দিনের পর দিন উপবেশন হয়তো অনধিকার কর্ম হইয়াছে অথবা ইহা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত সাব্যস্ত হইয়াছে, সেই কারণেই এই ডাক। ভয়ার্ত্ত মাণিকলাল দারোয়ানদের বিন্দুমাত্র উপেক্ষা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ না করিয়া তাহাদের প্রভুর বাটীতে গমন করিলেন। দারোয়ানদের নির্দেশে গলষ্টোন ম্যানসনের একটি বিশিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া এক সাহেবকে চেয়ারে উপবিষ্ট দেখিলেন। ইনি সেই স্যার হার্বার্ট হোমউড। হোমউড সাহেবের দেব সদৃশ কান্তি ও রূপচ্ছটায় মাণিকলাল যদিও অতীব বিমোহিত হইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর হইতে তখনও ভীতির ভাব অপসারিত হয় নাই। সাদরে অভ্যর্থনা জানাইয়া ও বসিতে বলিয়া মাণিকলালকে সাহেব অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, তিনি কি 'মেশায়া'? ঈশ্বরের অমৃতবাণী তিনি কিছু পরিবেশন করিতে পারেন কিনা? হিন্দুদের বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থের মীমাংসার সূত্রগুলি সম্বন্ধে কি তিনি সম্পূর্ণ অবহিত? মাত্র এই উদ্দেশ্যেই মাণিকলালকে আহ্বান করা হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিয়া মাণিকলালকে তাঁহার মন হইতে সমস্ত ভীতির ভাব কাটাইয়া আশ্বস্ত হইতে বলিলেন। মাণিকলালের কণ্ঠে 'হ্যাঁ', বা 'না' কিছুই স্ফুরণ হইতেছে না। অন্তরস্থ গুরুজী বলিতেছেন হ্যাঁ, কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত মাণিকলাল সবিনয়ে তাঁহার অক্ষমতাই প্রকাশ করিলেন। ইহাতে হোমউড সাহেব অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়া চিন্তা করিলেন, যে হয়তো বা প্রকৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয় নাই। ইতিমধ্যে তাঁহার চিন্তার জাল ছিন্ন করিয়া সংলগ্ন কক্ষান্তর হইতে তাঁহার ধর্মপ্রাণা সহধর্মিনী দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া তাঁহাদের কক্ষে প্রবেশের ও তাঁহাদের আলোচনায় যোগদানের জন্য অনুমতি ভিক্ষা করিলেন। তাঁহার প্রতীতি জন্মাইয়াছিল যে এই আগন্তুকই যথার্থ প্রজ্ঞাযুক্ত ও ঈশ্বরের প্রেরিত এবং মাত্র তাঁহাদের সন্দেহ নিরসনের জন্যই সমাগত। মাণিকলালের অক্ষমতা জ্ঞাপক বাক্য শ্রবণ করিয়া মেমসাহেব মাণিকলালকে বলিলেন যে "Well Babu let us try" তিনি স্বামীকে ইশারায় ইহাও ব্যক্ত করিলেন যে ইনিই সেই প্রকৃত ব্যক্তি। মেমসাহেবের সহানুভূতিসূচক উক্তিতে মাণিকলাল আশ্বস্ত হইলেন ও তাঁহাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণের সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অতঃপর মেঝেতে ফরাসের উপর উপবেশন করিয়া স্বামী-স্ত্রী দুইজনেই মাণিকলালকে তাঁহাদের মনে উদিত এক একটি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং মাণিকলাল তাঁহার মহাগুরুকে স্মরণ পূর্বক সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে প্রবৃত্ত হইলেন।

সাহেব দম্পতির মহান সমস্যা এই যে যদি একই সত্যপুরুষ দ্বারা বেদ, উপনিষদ্, বাইবেল, কোরান, পুরান, তন্ত্রাদি রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কখনওই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদ দৃষ্ট হইবে না। তবে ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী তত্ত্বের সমাবেশ কেন? মাণিকলাল তাঁহার স্বভাব মধুর বচনে তাঁহাদের প্রশ্নের যে মীমাংসা উপস্থিত করিলেন, তাহা শ্রবণে ও অনুধ্যানে সাহেব দম্পতি অনির্বচণীয় আনন্দে মুগ্ধ হইলেন। দৈবসত্তায় সত্তাবান মাণিকলালের ঈশ্বরানুরক্তি বিষয়ে সম্যক্ অবহিত হইয়া বেনেটোলা হইতে তাঁহাকে আনিবার জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাহেব তাঁহার নিজস্ব চাপরাশীকে গাড়ীসহ প্রেরণ করিতেন। এইভাবে তাঁহাদের নিয়মিত শাস্ত্রালোচনা চলিতে থাকে। তাঁহাদের এই নৈশকালীন ধর্ম ও শাস্ত্রালোচনায় কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বহু সাহেব ও বিচারকেরা যোগদান করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে স্যার জন উডরফের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একদিন হার্বার্ট সাহেব তাঁহার নিজ আলয়ে মাণিকলালের সহিত শাস্ত্রালোচনায় গভীরভাবে নিমগ্ন, এমন সময় কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার (দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় হার্বার্ট সাহেবের সাক্ষাৎ প্রার্থী হইলেন। হার্বার্ট সাহেবের সহিত সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় দীর্ঘক্ষণ অতিবাহিত হইলে দাস মহাশয়ের মনে বিরক্তির ভাব উপস্থিত হইল। কে বা কাহার সহিত মিতভাষী হার্বার্ট সাহেব এত গভীর আলোচনায় মগ্ন তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল বোধ হইল। কিয়ৎপরে মাণিকলাল হার্বার্ট সাহেবের কক্ষাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, তাঁহাকে দেখিয়া দাস মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ও এই প্রশ্নই তাঁহার মনে বারংবার উদিত হইল যে কে এই তরুণ; আর হার্বার্ট সাহেবের সহিত ইহার পরিচয় সূত্রই বা কি এবং তাঁহার সহিত সাহেবের কি এমন আলাপ যাহাতে হার্বার্ট সাহেবের মত এমন একজন বিজ্ঞ বিচারকের পক্ষে এই অসামান্য তন্ময়তা? পরবর্তীকালে দাস মহাশয় মাণিকলালকে ঐ সাহেবের কক্ষে আরও কয়েকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দাস মহাশয় আজ জীবিত নাই, কিন্তু তাঁহার (ব্যক্তিগত) একান্ত সচিব শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বহু বৎসর পর মাণিকদার চুঁচুড়ার বাসভবনে এই সমস্ত ঘটনা সমূহের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করেন। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি আসানসোলে ঢাকেশ্বরী কটন্ মিলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য চুঁচুড়াতেই তিনি গৃহ নির্মাণ করান, তাহাও বর্তমান রহিয়াছে। বর্তমানে তিনি ইহ জগতে নাই। *...ক্রমশঃ*

—শ্রীমাণিকলাল দত্ত মহাশয়ের শিষ্য,
শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

আমার গুরুদেব শ্রীঅভয়জীকে যেমন দেখেছি

একবার বাঘাযতীন 'কীর্তন কুটির' আশ্রমে আমার গুরুদেব শ্রীঅভয়জীর জন্মোৎসব পালিত হচ্ছিল। তারিখ এবং সালটা সঠিক মনে পড়ছে না। ঐ দিন ভোরবেলা থেকে রাত প্রায় ৯:৩০ পর্যন্ত নামগান, আবৃত্তি, ভাষণ এইরূপ নানা সৎসঙ্গের মধ্যে কেটেছিল। তারপর ধীরে ধীরে লাইট, মাইক প্যাণ্ডেল থেকে খুলে ফেলা হল। অনুষ্ঠান শেষে গুরুদেব চোখ বুঁজে একটু বিশ্রাম করছিলেন। রাত্রি ১০টা নাগাদ অনন্তাদি বললেন, ''বাবা, তুমি রাতে যতটুকু ইচ্ছা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। সারাদিন তোমার বিশ্রাম হয় নি।'' অভয়জী কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে চুপচাপ শুয়েই রইলেন।

হঠাৎ দেখি দুটো গাড়ী এসে কীর্তন কুটীরের দরজার কাছে দাঁড়ালো। তারপর শ্রীশ্রীমায়ের সন্তানেরা এক এক করে ঢুকে বললেন যে শ্রীশ্রীমা (শ্রীশ্রীসর্বাণী মা) এসেছেন। আমরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে বাবাকে বললাম, ''ঠাকুর, সর্বাণী মা এসেছেন।'' শুনে বাবার সে কী আনন্দ। আমাদের বললেন, ''তোরা সবাই এসে এখানে বোস।'' আবার অনুষ্ঠান হোল। তখন বুঝতে পারলাম কেন বাবা খেতে চাইছিলেন না কার অপেক্ষায় ছিলেন, বাবা যে অন্তর্যামী। তারপরেও প্রায় এক ঘন্টা মত অনুষ্ঠান হয়েছিল।

—শ্রীঅভয়জী চরণাশ্রিতা পরিপূর্ণা দেবী

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (৯)

শিষ্যের প্রতি তত্ত্বোপদেশ — (*পূর্ব প্রকাশিতের পর....*)

জীবের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলিব। ঈশ্বর সকলই করিতেছেন, তবে কি জীবের কর্তৃত্ব নাই? তোমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। তাহার উত্তরে বলিতেছি — জীব-কার্য্যের প্রেরণা পরমাত্মা হইতে আসিয়া থাকে। কিন্তু জীব-কার্য্য জীব প্রযত্ন সাপেক্ষ। এজন্য জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিতে হয়। বেদান্তদর্শনে এই বিষয় সূত্রীকৃত হইয়াছে 'পরাত্তুতচ্ছ্রু তত্তেঃ। প্রযত্ন সাপেক্ষস্তু কর্ত্তা শাস্ত্রর্থবত্তাৎ' ইত্যাদি। জীবকে কর্ত্তা না বলিলে শাস্ত্রের অর্থবত্তা থাকিবে না। শ্রুতি তাহার পরিচালনের জন্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ দিয়াছেন এবং মোক্ষমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। জীব যদি তাহার কিছুই করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইয়া যাইত। জীবের যাহা করিবার সাধ্য নাই শ্রুতি কি জন্য সে সকল উপদেশ দিবেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গদিগের জন্য ঐ সকল উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। কারণ ঐ সমস্ত উপদেশ অবধারণ ও অনুসরণ করিবার তাহাদের যোগ্যতা নাই। মানুষ ও মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীবদিগের জন্য শ্রুতি দ্বারা উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। জীবের কর্ম স্বতন্ত্র। ঈশ্বরের নিজকৃত কর্মফলের ভোগ নাই। জীব নিজকৃত কর্মফল ইহলোকে ও পরলোকে ভোগ করিয়া থাকে। তাহার পাপকর্মের জন্য দুঃখভোগ ও পুণ্যকর্মের জন্য সুখভোগ হইয়া থাকে। সেই সমস্ত কর্মের ফল নিয়ন্তা ঈশ্বর। বেদান্ত-দর্শনে উক্তি আছে — 'ফলমত উপপত্তেঃ'।

এক্ষণে জীবের 'অহঙ্কার' কাহাকে বলে সেই বিষয়ে কিছু বলিব। জীবের পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহ আছে এবং মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত সূক্ষ্মদেহ আছে। এতৎ সমস্তই ত্রিগুণাত্মক জড়। জীব চৈতন্যরূপ। দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহাকে চেতন বলা যায়। অনাদি অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃ বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদির সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। সেই সম্বন্ধবশতঃ তাঁহার স্থূল সূক্ষ্মদেহে 'আমি', 'আমার' ইত্যাদি অভিমান থাকা দৃষ্ট হয়। এই অভিমানকে 'অহঙ্কার' বলে। জীবের অবিদ্যা বা অজ্ঞান ইহার হেতু। সাধনের দ্বারা এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান তিরোহিত হইতে পারে। জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর বিরোধী। এজন্য জ্ঞানের দ্বারা ব্যতীত অজ্ঞানের নাশ অন্য প্রকারে হইতে পারে না। জীব অজ্ঞানবশতঃ আপনি যে স্থূল সূক্ষ্ম দেহাতীত চৈতন্যস্বরূপ, তাহা জানে না। জীবের নিজস্বরূপ নিজে জানাকেই জ্ঞান বলে। আর না জানাকেই অজ্ঞান বলে। তাহার আর সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান অনাদি হইলেও জ্ঞানের দ্বারা তাহার নাশ হয়। এজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন — 'নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' অয়ন শব্দের অর্থ গমন। অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তি। জ্ঞানোদয় ব্যতীত জন্ম মৃত্যুরূপ বন্ধন ছিন্ন হয় না।

জ্ঞানোদয়ের পর ঐ অহঙ্কার বিশুদ্ধভাব ধারণ করে। জীব তখন বলে 'আমিই ব্রহ্ম'। তখন তাঁহার আমিত্ব স্থূল, সূক্ষ্ম দেহের উপর স্থিত না থাকিয়া ব্রহ্মেই স্থিত হয়। এজন্য ব্রহ্মকেই জীবের স্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়। জ্ঞানোদয় হইলে জীবের সঞ্চিত কর্ম নাশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ ব্যতীত যায় না। পূর্বজন্মে মৃত্যুর পূর্বে সেই জন্মের বা পূর্ব পূর্ব জন্মের যে সকল পাপ ও পুণ্য কর্ম ফলোন্মুখ হয়, সেই সমস্ত একত্র মিলিত হইয়া ফল দিতে আরম্ভ করিয়া জীবের জন্ম, ভোগ ও আয়ুপ্রাপ্তির হেতু হয়। সেই সকল কর্মফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে প্রারব্ধ কর্ম বলে। অন্যান্য কর্ম যাহা ফল দিতে আরম্ভ করে নাই তাহাকে সঞ্চিত কর্ম বলে। প্রারব্ধ অতি তীব্র, কারণ উহা ফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রারব্ধ কর্মফল ভোগান্তে দেহপাত হয়। দেহান্তে তাঁহার কৈবল্য বা নির্বাণ-মুক্তি লাভ হয়। আর পুনর্জন্ম হয় না। অবিদ্যা নাশ হইলেও প্রারব্ধ কর্মফল ভোগের জন্য অবিদ্যার কিছু কিছু লেশ থাকে, দেহান্তে তাহার সমূলে নাশ হয়। জ্ঞানোদয়ের পর দেহান্ত পর্যন্ত তিনি যে সকল কর্ম করেন

তজ্জন্য তাহার ফল ভোগ হয় না। এজন্য ভগবদ্‌গীতায় উক্তি আছে ''যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে'' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ দিতে যেখানে আমি, আমার, আমাকে, আমাতে ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেখানে অর্থ পরমাত্মা, পরমাত্মার, পরমাত্মাকে, পরমাত্মাতে। দেহধারী পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের কথা দূরে থাকুক জ্ঞানোদয় জীবন্মুক্ত হওয়ার পর জীব ঐরূপ শব্দ ব্যবহার করেন, ইহা শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়।

ইহার হেতু এই, তিনি যখন আপনাকে পরমাত্মা বলিয়াই জানেন তদ্দ্বারা যে এতগুলি পরমাত্মা হইল তাহা নহে। একই পরমাত্মাকে সকল মুক্তপুরুষই লক্ষ্য করিয়া 'আমি' বলিয়া নির্দেশ করেন। ভগবদ্‌গীতায় কোথাও 'আমি' আছে এবং কোথাও 'তিনি' আছেন, উভয় শব্দই পরমাত্মাবাচী। বদ্ধজীবে স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞান ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় থাকিয়া পরে সাধন দ্বারা ভস্মের অপগম হইলে স্বতঃই প্রকাশিত হয়। ভগবদ্‌গীতায় এবং অন্যান্য শাস্ত্রের যেরূপ ভক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে সেইরূপ জ্ঞানেরও মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে ভগবদ্‌গীতায় উক্তি আছে — ''জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা'' — অর্থাৎ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সমস্ত পাপ-পুণ্য কর্ম নাশ হয়। ''তদ্বুদ্ধয় স্তদাত্মান স্তন্নিষ্ঠা স্তৎপরানা গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধত কল্মষাঃ।'' ইহার অর্থ — ঈশ্বরগত প্রাণ হইয়া ভক্তিযোগে তাঁহার আরাধনা করিলে জ্ঞানোদয়ে সমস্ত পাপ ধৌত হয় এবং পুনর্জন্ম হয় না।

''নহিজ্ঞানেন সদৃশ পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ংযোগ সংসিদ্ধ কালেনাত্মনি বিন্দতি।''

ইহার অর্থ — জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই, তাহা যোগসংসিদ্ধ হইয়া পরে আত্মাতেই লাভ হয়।

''ত্রিভির্গুনময়ৈর্ভাবৈরেভিরিদং জগৎ
মোহিতং নাভি জ্ঞানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ং''

ইহার অর্থ — সত্ত্ব, রজো, তমো এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা মোহপ্রাপ্ত থাকিয়া আমাকে ত্রিগুণের অতীত বলিয়া জানিতে পারে না। এখানে ত্রিগুণাতীত অবস্থা যে স্বরূপাবস্থা তাহাই উক্ত হইল। আরোও এরূপ অনেক উক্তি ভগবদ্‌গীতাতে আছে। যথা —

''সর্ব্বঞ্চাখিলং কর্ম্মজ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে। জ্ঞানং লব্ধাপরাং শান্তিং। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেনমুহ্যন্তি জন্তবঃ। অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাং। শান্তিংনির্ব্বাণ পরমাং মৎ সংস্তামধিগচ্ছতি। লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণং মৃষয়ঃ ক্ষীণ কল্মষাঃ। গচ্ছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বে প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ।'' এখানে 'তত্ত্বেন' শব্দের অর্থ — তাঁহার গুণাতীত সচ্চিদানন্দ স্বরূপত্ত্ব। 'প্রবেষ্টুঞ্চ' শব্দের অর্থ — জীব তাঁহাকে দর্শন করিয়া ও জানিয়া পরে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হয়। ইহাই কৈবল্য বা নির্বাণমুক্তি।

অন্যত্র বলিয়াছেন — ''শান্তিং নির্বাণ পরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।'' ইহার অর্থ — আমাতে সংস্থিত হইয়া নির্বাণমুক্তিরূপ শান্তি লাভ করেন। জীবের পরমাত্ম স্বরূপ লাভকেই নির্বাণ বা কৈবল্যমুক্তি বলে। পরমাত্মা অখণ্ড চৈতন্য, অখণ্ডৈক রসস্বরূপ। তিনি তখন পরমশান্তি পরমানন্দ ভোগ করেন। কেবল যে তাহারই দুঃখের নিবৃত্তি হয় তাহা নহে। জীব বিদেহমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে স্থিত হয়। ইহাই সাধনের চরমোৎকর্ষাবস্থা। *...ক্রমশঃ*

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠানসূচী

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা— ১৩ই অক্টোবর, রবিবার
বার্ষিক সাধারণ সভা — ১০ই নভেম্বর, রবিবার
রাস পূর্ণিমা — ১২ই নভেম্বর, মঙ্গলবার
বার্ষিক শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর প্রতিষ্ঠা পূজা - ৪ঠা ডিসেম্বর, বুধবার
বার্ষিক শ্রীলক্ষ্মীজনার্দ্দনজীউয়ের প্রতিষ্ঠা পূজা - ৫ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার
শ্রীশ্রীসারদা মায়ের আবির্ভাব তিথি — ১৮ই ডিসেম্বর, বুধবার
আধ্যাত্মিক সভা — ২৫শে ডিসেম্বর, বুধবার
শ্রীশ্রীমায়ের প্রবচন—২৯শে ডিসেম্বর, রবিবার সকাল ১১টা
শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস — ১৫ই জানুয়ারী, ২০২০, বুধবার

পুণ্যতোয়া কাবেরী

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

একবার প্রলয়কালে বালকরূপী শ্রীহরি মার্কণ্ডেয় ঋষিকে তাঁহার দেহাভ্যন্তরে আশ্রয় দিয়াছিলেন। প্রলয়কালে ধরিত্রী জলনিমগ্ন হইলে পরে ঐভাবেই শ্রীহরি মার্কণ্ডেয় ঋষির প্রাণরক্ষা করেন। শ্রীহরির দেহে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়া তখন দেহের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মার্কণ্ডেয় তাঁহার উদরের ভিতর বহু নদীকে দেখিতে পান। সেগুলির মধ্যে 'কাবেরী' একটি নদী।

পুরাণে কাবেরী নদীকে নারীরূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। কাবেরী যুবনাশ্বের কন্যা এবং পিতার অভিশাপে তিনি নদীরূপ প্রাপ্ত হন। পুরাণ প্রসিদ্ধ জহ্নুমুনি যুবনাশ্ব রাজার নদীরূপা কন্যা কাবেরীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কাবেরী ও জহ্নুর এক পুত্র ছিল। তাঁহার নাম সুহোত্র। নদীমাতৃকা কাবেরীর আরেক নাম দক্ষিণের-গঙ্গা। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান ও পবিত্র নদী কাবেরী। মহাভারতের সভাপর্বে আছে যে স্বর্লোকে বরুণদেবের সভায় যে সকল নদীমাতৃকাগণ উপযুক্ত দেহধারণপূর্বক তাঁহার উপাসনা করেন তন্মধ্যে কাবেরী অন্যতমা। এই নদীটি সর্বদাই অপ্সরাগণের দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কাবেরীতে স্নান করিলে সহস্র গো-দানের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গলোক বাস হইয়া থাকে। কাবেরী ও নর্মদা নদীর সঙ্গমস্থল কাবেরী-সঙ্গম বলিয়া পরিচিত। এটি একটি অতি পবিত্র তীর্থ। এই স্থলে কুবের হাজার বৎসর ব্যাপী মহাদেবের তপস্যা করিয়া যক্ষাধিপতিপদ লাভ করিয়াছিলেন। এই তীর্থ দর্শনে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং ইহার জল স্পর্শ করিলেই স্বর্গলাভ হয়।

কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থল সাহাদ্রি (সহ্যাদ্রি) পর্বত। পুরাণে কথিত আছে যে লোমশ ঋষি তপঃপ্রভাবে কাবেরীকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনয়ন করেন। তীর্থ ভ্রমণের সময় স্বয়ং বলরাম এই পবিত্র নদী তীর্থকে পরিক্রমা করিয়াছিলেন।

কাবেরী নদী পবিত্র অগ্নির উৎপত্তিস্থল। হব্যবহনকারী অগ্নি যে ষোলটি নদীকে কামনা করেন; তন্মধ্যে কাবেরী অন্যতমা।

(সহায়ক গ্রন্থ : বায়ুপুরাণ, হরিবংশ, মহাভারত, ভাগবত)

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা

(৬)

শ্রীশ্রীমায়ের অধ্যাত্ম প্রসঙ্গে — ইং ২৭/৮/২০১৯

অন্তরাকাশ দেখতে দেখতে যোগীর চক্ষুদ্বয় আকাশের মতোই হয়ে যায়। যোগীর দৃষ্টিতে থাকে অনাবিল শান্তভাবের প্রতিচ্ছবি এবং সেই দৃষ্টি হয় অতি গভীর। প্রকৃত যোগীর চোখের মধ্যেই থাকে অসীমের প্রকাশ। সিদ্ধ মহাত্মাদের দেহের প্রতি কোষে ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশ থাকে যার ফলে তাঁদের দেহের চারিপাশে একটি চিৎপ্রভা বিরাজ করে। সাধারণ মানুষ সেই চিৎপ্রভার সান্নিধ্যে এলে পরে তখন তার দেহও চিৎপ্রভায় স্নাত হয়ে আধার শুদ্ধিকরণ হয়। এর ফলে সেই আধারের মধ্যে স্বভাবের কিছু পরিবর্তন হয়। তাই মহাত্মাগণের সান্নিধ্যকে বলা হয় 'সৎসঙ্গ'। সৎসঙ্গে থেকে মহাত্মাগণের সদুপদেশ যদি কেউ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পালন করতে পারে তবে তার অনন্ত মঙ্গল হয়। মঙ্গল অর্থে জাগতিক উন্নতি নয়, ওটিতে আত্মসত্তার মুক্তির পথ সুগম হয়। মহাত্মাগণ সর্বদাই নির্বিকার থাকেন। কার মুক্তিমার্গ প্রাপ্ত হল আর কার মুক্তিমার্গ প্রাপ্তি হল না, তাই নিয়ে মহাত্মাদের মাথাব্যথা হয় না, তাঁরা সমভাবে সকলকেই আলো দেন; যে মহাত্মাদের কাছে প্রাপ্ত আলোর উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, তার অন্তঃকরণে অবশ্যই আধ্যাত্মিক চেতনার প্রসারতা লাভ করে। জীবাত্মা এই ভাবেই 'চিন্ময়' বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। এইভাবেই জীবন্মুক্ত নির্লিপ্ত নির্বিকার যোগীশ্বরগণ মানুষের অনন্ত মঙ্গল সাধন করে থাকেন।

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(২৪)

শ্রুতিস্মৃতিমবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া।
তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তা ইতরে বেশধারিণঃ।। ৭৫

শ্রুতিস্মৃতিম্ অবিজ্ঞায় কেবলং গুরুসেবয়া (যে জনাঃ গুরুং জানন্তি) তে বৈ সন্ন্যাসিনঃ প্রোক্তাঃ, ইতরে (জনাঃ) বেশধারিণঃ (সন্ন্যাস-বেশধারিণঃ এব ন তু সন্ন্যাসিনঃ ইতি বিজানীয়াৎ)।।৭৫

যখন ইহা স্থির হইল যে গুরুকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে হইবে, তখন শ্রুতি ও স্মৃতিবাক্য পাঠের দ্বারা পরোক্ষভাবে অবগতি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে (স্মৃতি অর্থাৎ যদ্দ্বারা গুরুকে স্মরণ করা যায়, এবং বেদ অর্থাৎ যদ্দ্বারা গুরুকে জানা যায়); সুতরাং বলিতেছেন যে, কেবলমাত্র গুরুসেবা করিয়া যাও, অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্থিত গুরুপদে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিয়া যাও, তাহা হইলে তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়াও পরিচিত হইবে (অর্থাৎ অন্ধকার ছাড়িয়া আলোকআশ্রয়ে যে আছে সেই সন্ন্যাসী); এবং অপরাপর যাহারা আলোকআশ্রয়ে নাই, এবং বাহ্যরূপকে আলোক ভাবিয়া অন্ধকারকেই আলোক বলিতেছে, অথচ বাহ্যভাবে সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করিয়া সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহারা মিথ্যা বেশধারী কপট সন্ন্যাসী মাত্র।। ৭৫

গুরুকৃপা প্রসাদেন আত্মারামো হি লভ্যতে।
অনেন গুরুমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।। ৭৬

গুরুকৃপাপ্রসাদেন (নরেণ) আত্মারামঃ হি (নিশ্চিতং) লভ্যতে, অনেন গুরুমার্গেণ আত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে।।৭৬

গুরু সেবার দ্বারা গুরুর কৃপা হয়, এবং কৃপা হইয়া গুরু প্রসন্নভাব ধারণ করেন, গুরু প্রসন্ন হইলে জীব আত্মানন্দ লাভ করে (অর্থাৎ জীব পরসঙ্গে কষ্ট পাইতেছিল, এক্ষণে গুরুমার্গ অবলম্বন করিয়া আত্মসঙ্গে আনন্দ পাইতেছে —'আত্মারামঃ ফলাশী গুরুচরণরতঃ'), এবং এই গুরুমার্গে গতি হইয়া জীবের আত্মজ্ঞান লাভ হইতেছে অর্থাৎ গুরুই আত্মস্বরূপ এবং দেহ বা জগৎ পর ইহাই জ্ঞান হইতেছে।। ৭৬

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং পরমাত্মস্বরূপকম্।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব প্রণমামি জগদগুরুম্।। ৭৭

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং (পরিব্যাপ্তং) পরমাত্মস্বরূপকং (যৎব্রহ্ম) স্থাবরং জঙ্গমং চ এব (দৃশ্যতে) জগন্ময়ং (তৎ গুরুং) প্রণমামি।। ৭৭

এই দেহরূপ সংসারবৃক্ষের শীর্ষস্থান বা মূল হইতেছে ঊর্দ্ধে, (গীতা ১৫ শ অঃ, ১ম শ্লোক দেখ) অধস্তম স্থান বা বৃক্ষকাণ্ডের অগ্রভাগ হইতেছে নিম্নস্থিত মূলাধার (মূলের আধার বলিয়া ইহাকে মূলাধার বলে) অর্থাৎ ইহাই পরমাত্মার প্রকাশমান রূপ অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক এই প্রকাশমান জগৎই পরমাত্মার রূপস্বরূপ। এমত জগৎব্যাপী পরমাত্মস্বরূপ গুরুকে নমস্কার করিতেছি।। ৭৭

এই বৃক্ষ হইতেছে ব্রহ্মের কল্পনাপ্রসূত জীবদেহ, জীব ঊর্দ্ধ হইতে অধঃ এবং অধঃ হইতে ঊর্দ্ধ, এই দ্বিবিধ গতির দ্বারা কর্ম করিতেছে, সুতরাং ব্রহ্মসম্ভূত কর্মই জীবের জীবনরক্ষার উপায়স্বরূপ (গীতা ৩য় অঃ, ১৫ শ্লোক দেখ)। অর্থাৎ যাবৎ কর্ম আছে তাবৎ দেহ আছে কর্ম ঘুচিলে কাহারও বা ব্রহ্মে লয় হয়, এবং কাহারও বা দেহতে লয় হয়, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই কর্মের দুইজন নিয়ামক হইতেছেন একজন ব্রহ্ম যিনি ঊর্দ্ধে আছেন এবং অপর মোহ যাহা দেহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। এক কর্মের দ্বারা কর্ম শেষ হইয়া ব্রহ্মে লয় হয়, এবং অন্য কর্মের দ্বারা কর্ম শেষ না হইয়া উপর্য্যুপরি বহু কর্মের সঞ্চার হইয়া থাকে। পরন্তু দেহ তো চিরকাল থাকিবে না, কর্মের সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও অবসান হয়, এবং জীবেরও কর্মবশে দেহ হইতে পুনরায় দেহ-কল্পনায় জন্মান্তর গতি হয় এই ভাবে জন্ম হইতে জন্মান্তর গতির দ্বারা পরিশেষে জীব যে সূত্রাবলম্বনে কর্ম করিতে সক্ষম হইয়াছিল, সে সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তখন মোহ তাহাকে বেড়িয়া ফেলে — জীব অন্ধকারময় পাতালে গিয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকে। এই দুর্গতি এড়াইবার জন্যই হইতেছে ব্রহ্ম ক্রিয়ার সাধন, জীব যাহাতে ব্রহ্মসূত্রাবলম্বনের দ্বারা ঊর্দ্ধে গতি হইয়া ব্রহ্মে মিশিয়া কর্ম শেষ করিতে পারে, ইহাই হইল জীবন যাত্রার সুচারুরূপে যাত্রা শেষ করিবার উপায় এবং ইহাই জীবধর্মের কর্ত্তব্য কর্ম, নচেৎ মোহানুগত্যে পরধর্মানুশীলনে অকৃতজ্ঞ জীবের অধর্মের পরিচয় হইয়া থাকে। যেখান হইতে উৎপত্তি সেইখানে নিবৃত্তি ইহাই ধর্মপন্থা, এবং ভিন্নপন্থাবলম্বনে ভিন্ন বিষয়ে পরিণতি, ইহাই অধর্মপন্থা। *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও
সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৬৮)

একবার আমি (শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া) আমার ছোট ভগ্নীপতিকে নিয়ে শ্রীশ্রীবাবার (শ্রীশ্রীসরোজ বাবা) কাছে গিয়েছিলাম। আমার ভগ্নীপতি ছিল ক্রিকেট খেলা পাগল। ক্রিকেটের আলোচনা ছাড়া আর কোনো ব্যাপারেই তার interest ছিল না। যখন শ্রীশ্রীবাবার কাছে সন্ধ্যাবেলা তাকে নিয়ে গেলাম, গুরুমহারাজ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে কোনো এক বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন। দেখলাম ভগ্নীপতির সেইসব আলোচনা শুনতে মোটেই আগ্রহ ছিল না। শ্রীশ্রীবাবা তখন হঠাৎ ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন, এমনভাবে আলোচনা করছিলেন যেন বাবা ক্রিকেটের সব খেলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন এবং বাবার ব্যাট ও বল করার দারুণ অভিজ্ঞতা। তখন দেখলাম ভগ্নীপতি খুব উৎসাহ দেখালো। কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা চলার পর বাবা আর অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বললেন না। তারপর আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। আসতে আসতে ভগ্নীপতি বললেন, ''তোমার গুরুদেব টি.ভি তে খুব খেলা দেখেন।'' আমি বললাম, ''বাবার সময় কোথায়, বাবা তো সব সময়ই ভাবস্থ হয়ে থাকেন।''

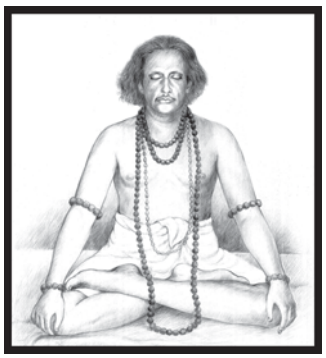

আমি আমার গুরু মহারাজের যে মহাভাব দেখেছি, ঠিক তেমনই আমাদের আশ্রমের শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে মহাভাব দেখতে পাই।

প্রসঙ্গ (৬৯)

আমি (শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া) একবার আমার এক ডাক্তার বন্ধুকে নিয়ে শ্রীশ্রীবাবার (শ্রীশ্রীসরোজ বাবা) কাছে গিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন Child Specialist শ্রীশ্রীবাবার সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলে বাবা বললেন, ''আমাদের দেশে এখনও ভাল Child Specialist-এর অভাব। এছাড়াও আরও অনেক কথা বললেন। ডাক্তার বন্ধুটি এতটাই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে গুরুমহারাজকে দিতে গেলে শ্রীশ্রীবাবা জিজ্ঞাসা করলেন ''এটা কি?'' বন্ধুটি বললেন, ''বাবা এটা সামান্য দক্ষিণা।'' গুরুজী রেগে গিয়ে বললেন যেটা দিতে এসেছ সেটা এক্ষুণি পকেটে ঢোকাও। বন্ধুটি ভয় পেয়ে বললেন, ''বাবা, একটু কৃপা করবেন না?'' বাবা বললেন ''আমি তোমায় যা বললাম তা কর। এখন বাড়ী যাও। আবার পরে আসবে।''

এই অর্থ নেওয়ার ব্যাপারে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম বাবা সাধারণতঃ হাতে অর্থ নিতেন না এবং সবাইকার কাছ থেকে কিছুতেই অর্থ নিতেন না। পরে আমি শুনেছিলাম যে বাবা সেই ব্যক্তির আধার দেখতেন এবং পূর্বজন্মের কৃত ফল দেখতেন। আমি দেখেছি এবং অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন সন্তানের কাছে শুনেছি যে শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যেও এই একইভাব প্রবলভাবে বিরাজিত।

প্রসঙ্গ (৭০)

আমার গুরুদেবের (শ্রীশ্রীসরোজ বাবা) বাড়ীতে তখন দুর্গাপূজা হোত আমরা সবাই খুব আনন্দ করতাম। কোনো এক বছর দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে সকালে হঠাৎ মিহিরদা (বাবার ক্রিয়ান্বিত সন্তান) আমাদের (শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া) বাড়ীতে এসে মাকে বললেন, ''বাবা আপনার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন, পূজাতে ৩,০০০/- টাকা কম পড়ছে, যা প্রদীপের মাকে বলে নিয়ে আয়।'' দুর্গাপূজার মতন অত বড় পূজায় ৩,০০০/- টাকা বাবা চেয়ে পাঠিয়েছেন এই আনন্দে মা আলমারি খুলে দেখলেন যে মায়ের একটু একটু করে জমানো ৩,০০০/- টাকাই ছিল। মা সেটা মিহিরদাকে দিয়ে দিলেন।

পূজা ভাল ভাবে কেটে গেল। হঠাৎ মায়ের মনে হল যে বাবা তো ইচ্ছা করলেই ৩,০০০/- টাকা সংগ্রহ করতে পারতেন, তা ছাড়া বাবার তো অনেক ধনী শিষ্য আছে। এই মনে হতে মা যখনই শ্রীশ্রীবাবার কাছে আসতেন তখনই বাবাকে বলতেন ''বাবা পূজা তো মিটে গেছে আমার মতন মধ্যবিত্তের কাছে আপনার টাকাটা নেওয়া উচিৎ হয় নি। আমার টাকাটা দিয়ে দিন।'' একদিন শ্রীশ্রীবাবা মাকে বললেন ''মা চিন্তা করবেন না, আপনার অনেক দিনের কষ্টে জমানো টাকা, তবে টাকাটা খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন।''

আমার বাবা টেলিফোন অফিসে চাকরি করতেন।

আমাদের বাড়ীতে ফোন নেবার সময় ৩,০০০/- টাকা Caution Money জমা নিয়েছিল। হঠাৎ-ই Central Government (P &T Dept.) ঘোষণা করল যে এই Caution Money যারা টেলিফোন অফিসে চাকরি করেন তাদের ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট সময় ৩,০০০/- টাকা ফেরত দেওয়া হয় ও গুরুদেবের কথা অনুযায়ী আমার মাও টাকাটা পেয়ে যান।

প্রসঙ্গ (৭১)

আমার মা তখন গুরুদেবের কাছে খুব যাতায়াত করেন। একদিন রাত্রি ৯টার সময় মায়ের খুব ইচ্ছে হল শ্রীশ্রীবাবাকে পায়েস খাওয়াবেন, মা তখন পায়েস বানিয়ে নিয়ে রিক্সায় করে রাত প্রায় ১০:৩০ নাগাদ শ্রীশ্রীসরোজবাবার বাড়ী গেলেন। মা দেখলেন বাবার বাড়ীর একতলার দরজা ভেজানো আছে, কোনো লোকজন নেই, বাবা একা বসে আছেন থালায় রুটি এবং বাটিতে তরকারি রয়েছে, বাবার সেজ মেয়ে 'সোনা' দাঁড়িয়ে আছে, মাকে দেখে বলল, ''দেখুননা, বাবা কিছুতেই রুটি খাচ্ছেন না খালি একই কথা বলে যাচ্ছেন - আমার খুব পায়েস খেতে ইচ্ছে করছে আমি পায়েস খাবো। এত রাত্রিতে কোথায় পায়েস পাই বলুন তো! মাকে বলতে মা বললেন যে কালকে করে দেব।'' আমার মা তখন বললেন, ''আমি পায়েস নিয়ে এসেছি।'' সোনা তখন শ্রীশ্রীবাবাকে বলল ''প্রদীপবাবুর মা তোমার জন্য পায়েস নিয়ে এসেছেন এবার খেয়ে নাও।'' বাবা বললেন, ''ও আচ্ছা, খাব।'' তারপর শ্রীশ্রীবাবা মাকে বললেন ''মা, অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছে, আপনি বাড়ি যান।'' *...ক্রমশঃ*

—মাতৃ-পিতৃ চরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়,
শিবপুর, হাওড়া

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ-ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে :—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

১১। (পত্র নং ১০, প্রঃ ২)—(দ্বিতীয় ভাগ) ৩৩ পৃষ্ঠায় কবিরাজজী দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের 'আধার' বা 'নিমিত্ত', ১০৩ প্রভৃতির যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন সেই সম্বন্ধে - শ্রীমার মত কি?

কৃপাহীন মার্গে ১০৩ হইতে ১০৫ হয়। ১০৪ হইতে উঠিতে হয় না, তদ্রূপ ১০৫ হইতেই ১০৯ হয়, ৬,৭,৮ ভেদ করিতে হয় না। — এই বিষয়ে শ্রীমা যদি কিছু বলেন — ইহার রহস্য কি? কেন ৬,৭,৮ স্তর ভেদ করিতে হয় না?

উত্তর — (পত্র ১০, প্রঃ ২, দ্বিতীয় ভাগ) — সমগ্র সন্তমণ্ডল ও মহাযোগীশ্বর সিদ্ধ সদ্‌গুরু জগৎকল্যাণের নিমিত্ত যে ব্যক্তিত্বকে নির্বাচন করিয়া থাকেন, সদ্‌গুরু তাঁহার অধ্যাত্ম কর্ম সম্পাদনের জন্য যাঁহাকে অভিষিক্ত করেন, তিনিই হইলেন 'আধার' বা 'নিমিত্ত'। সদ্‌গুরুর চিত্তগত বিশুদ্ধভাবের সঙ্গে সেই আধার 'তদাত্ম্যভাব' অর্থাৎ তদ্‌গতচিত্ত ভাব প্রাপ্ত হন এবং তাহার ফলে সদ্‌গুরুশক্তি সেই আধার মধ্যে পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হয়। ইহার ফলস্বরূপ

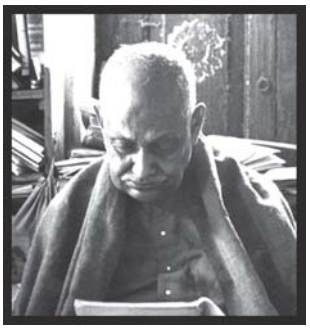

আধাররূপী শিষ্য ১০৩-এ উপনীত হওয়া মাত্রই পরাভক্তিযোগে বিশুদ্ধভাব লব্ধ হইয়া নিজ অন্তঃকরণ শুদ্ধকরতঃ অত্যল্পকালের মধ্যেই গুরুশক্তি মস্তকে ধারণ করতঃ শিবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সদ্‌গুরু-শিষ্য অভেদ সত্তা হইয়া যান। অবশ্যই ওই আধার-এর জন্মার্জিত অখণ্ড তপোবল ও প্রবল সংস্কার থাকে। কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছেন —''এই আধাতেই সদ্‌গুরুর অনন্ত ঐশ্বর্য্য নিহিত হয়। মরদেহ সম্পন্ন 'আধা'কে এই প্রকার গুরুভার বহনের উপযোগী করিবার জন্য অতি কঠোর তপশ্চর্য্যার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়।'' এই তপস্যা সাধিত হইবার কালে স্থূলদেহের নিমিত্ত কোন খাদ্য গ্রহণ করা চলে না; মস্তকস্থ সহস্রারের অমৃত ক্ষরণের দ্বারাই দেহ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে এবং সৌরশক্তির তেজে শিষ্যের দেহ ক্রমশঃ ওজস্বী হইয়া ওঠে। *—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা*

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গণ্ডকী নদীর কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

বায়ু পুরাণ মতে স্বর্গে প্রবাহিত গণ্ডকী নদীকে মহর্ষি লোমশ কঠোর তপোবলে মর্ত্যে অবতরণ করান। বরাহ পুরাণে গণ্ডকী নদীর উৎপত্তির বিষয়ে এক অভিনব কাহিনী আছে। পুরাকালে ভগবান বিষ্ণু একদা হিমালয় পর্বতে কঠিন তপস্যা আরম্ভ করেন। দীর্ঘকাল তপোরত থাকিবার ফলে একসময় ভগবান বিষ্ণুর গণ্ডদেশ হইতে প্রচুর স্বেদরাশির উদ্ভব হয়। সেই স্বেদরাশি হইতে একটি নদীর জন্ম হয়। ভগবান বিষ্ণুর গণ্ডদেশ হইতে নিঃসৃত স্বেদ হইতে জন্ম হইয়াছে বলিয়া মহাদেব নদীটির নামকরণ করিলেন 'গণ্ডকী'।

গণ্ডকী বা কালীগণ্ডকী নদীর উৎপত্তি নেপাল-তিব্বত সীমান্তে অবস্থিত হিমালয় পর্বতের হিমবাহ হইতে। এটি গঙ্গার একটি প্রধান উপনদী। গণ্ডকী নদীকে মহাভারতে সর্বতীর্থবারি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গণ্ডকী নদী পবিত্র জলধারা বলিয়া যেমন পুরাণ প্রসিদ্ধ, তেমনিই শালগ্রাম শিলার উৎপত্তিস্থল এবং প্রাপ্তিস্থান বলিয়া বিখ্যাত। একমাত্র গণ্ডকী নদীতেই শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। বরাহ পুরাণে গণ্ডকী নদীতে শালগ্রাম শিলার উৎপত্তি বিষয়ে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। যথা — একসময় তৃণবিন্দু নামক এক ঋষি ছিলেন, জয় এবং বিজয় নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। জয় এবং বিজয় দুজনেই ভগবান বিষ্ণুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের নিরন্তর আরাধনায় ভক্তবৎসল হরি এতটাই সন্তুষ্ট ছিলেন যে তিনিও জয় বিজয়ের প্রতি অতীব স্নেহভাব পোষণ করিতেন। একদা রাজা মরুত্ত এক বৃহৎ যজ্ঞের আয়োজন করেন, সেই যজ্ঞের পুরোহিতদিগের মধ্যে জয় ও বিজয়ও ছিলেন অন্যতম। মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে পরে রাজা জয়-বিজয়কে প্রচুর ধন সম্পদ দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন। গৃহে ফিরিয়া সেই দক্ষিণাস্বরূপ ধন সম্পদ বন্টন করিবার সময় দুই ভ্রাতার মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল। সেই কলহ একসময় এমনই চরমে উঠিল যে জয়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়কে বলিলেন — ''তুমি দক্ষিণাস্বরূপ যাহা গ্রহণ করিয়াছ, তাহার অংশ যদি আমাকে প্রদান না কর তাহা হইলে আজ হইতে তুমি মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া 'গ্রাহ' (অর্থাৎ, কুম্ভীর জাতীয় জলজন্তু বিশেষ) হও।'' জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভিশম্পাত শুনিয়া ক্রুদ্ধ বিজয়ও পাল্টা অভিশাপ দিলেন — ''তুমি হাতীতে রূপান্তরিত হও।'' এইভাবে জয় এবং বিজয় গণ্ডকী নদীতে কুমীর এবং হস্তীর রূপ প্রাপ্ত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পরন্তু এই অবস্থায়ও উহাদের কলহ বন্ধ হইল না। বরং তাহা যুদ্ধে পরিণত হইল। গণ্ডকী নদীর জলে হাতী এবং কুমীরের মধ্যে তুমুল লড়াই চলিতে লাগিল দীর্ঘকাল ধরিয়া। বিশালকায় দুই প্রাণীর যুদ্ধে গণ্ডকী নদীর জলে বসবাসকারী বহু নিরীহ প্রাণীর মৃত্যু হইতে লাগিল এবং নদীর জল অপবিত্র হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জলের দেবতা বরুণদেব তখন ভগবান বিষ্ণুকে অনুরোধ করিলেন, ঐ দুই প্রাণীর যুদ্ধ বন্ধ করিয়া গণ্ডকী নদীকে রক্ষা করিতে। বরুণদেবের প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু তখন সুদর্শনচক্রের আঘাতে জয়-বিজয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। জয়-বিজয়ের উপর প্রহার করিবার কালে নারায়ণের সুদর্শনচক্র গণ্ডকী নদীর খাতে অবস্থিত শিলাগুলিকে একাধিকবার আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে গণ্ডকী নদীর এই শিলাগুলিতে ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের দাগ পড়িয়া যায়। ভগবান বিষ্ণুর সুদর্শনচক্র লাঞ্ছিত এই শিলাগুলিই পরবর্তীকালে 'শালগ্রাম শিলা' বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

বরাহ পুরাণে ঐ একই অধ্যায়ে গণ্ডকী নদীতে শালগ্রামশিলার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একসময়ে স্বয়ং গণ্ডকী নদীই সুদীর্ঘকাল ব্যাপী ভগবান বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিবার জন্যে কঠোর তপ করিয়াছিলেন। গণ্ডকী নদীর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান বিষ্ণু সশরীরে তাহাকে দর্শন দিলেন এবং বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন গণ্ডকী নদী বলিলেন —''প্রভু! আপনি যদি সত্যই প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন।'' ভগবান বলিলেন -''তথাস্তু! আজ হইতে তোমার গর্ভে আমি স্বয়ং শিলাময়রূপ ধারণ করিয়া সর্বদা বাস করিব। আমাকে পুত্র রূপে লাভ করিবার ফলে তুমি মর্ত্যের অন্যতম পবিত্র নদী বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। তোমাতে স্নান কিংবা দর্শনমাত্র মানুষের সর্বপাপ বিনষ্ট হইবে।'' এই কথা বলিয়া ভগবান বিষ্ণু শিলারূপে গণ্ডকী নদীগর্ভে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই শিলাময়রূপ সুদর্শনচক্র চিহ্নিত ও বজ্রকীট দংশন যুক্ত। এই শিলাই 'শালগ্রাম শিলা' নামে জগত-প্রসিদ্ধ।

(বায়ু পুরাণ ও বরাহ পুরাণ হইতে সংগৃহীত)

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

(৩৭)

দেবতা ইন্দ্র — (পূর্ব প্রকাশিতের পর....)

ইন্দ্র দেবতার পিতা-মাতার সঠিক নাম কি, তা বলা মুশকিল, কারণ বেদের বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন প্রকার নাম পাওয়া যায়। দ্যাবাপৃথিবীকে যেমন তাঁর পিতা-মাতা বলা হয়েছে (ঋক্ সং ৮/৫১/২), তেমনি দ্যৌ তাঁর পিতা এবং নিষ্টিগ্রীকে তাঁর মাতা বলা হয়েছে (ঋক্ সং ৪/১৭/৪, ১০/১০১/১২) ইত্যাদি। টীকাকারেরা অবশ্য এঁকেই অদিতি বলে অভিহিত করেছেন। তৃতীয় মণ্ডলের একটি মন্ত্রে (৩/৪৯/১) আবার একাষ্টকার পুত্র বলে ইন্দ্রকে দেখান হয়েছে — 'একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা জজান গর্ভং মহিমানমিন্দ্রম্'। বেদেরই অন্যত্র আবার পাই - অসুরদের ধ্বংসের জন্য দেবতারা ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছিলেন -'ধনং বৃত্রাণাং জনয়ন্তো দেবাঃ'। পৌরাণিক সাহিত্যে অবশ্য কশ্যপ ও অদিতিকে ইন্দ্রের পিতা, মাতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যানে (১১/১/৫/১৪) অগ্নি, সোম প্রভৃতি দেবতার মত ইন্দ্রও প্রজাপতির থেকেই সৃষ্ট একথা পাই। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের মতে সমস্ত দেবতাকে সৃষ্টি করার পরে প্রজাপতি তাঁদের সংরক্ষণের জন্যই ইন্দ্রকে সৃষ্টি করেছিলেন। ঋগ্বেদের দুটি সূক্তে (৩/৪৮, ৪/১৮) সম্পূর্ণভাবে তাঁর জন্মের বিবরণ আছে।

ইন্দ্রের স্ত্রীর কথা ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে পাওয়া যায় (ঋক্ সং ১/৮২/৫,৬; ৩/৫৩/৪,৬; ১০/৬৩/৯,১০)। বিশ্বামিত্র ঋষি বলেছেন — ইন্দ্রের গৃহে কল্যাণকারিণী জায়া আছেন। ইন্দ্র শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে তাঁকে ইন্দ্রাণী বলা হয়েছে (ঋক্ সং ১/২২/১২)। দশম মণ্ডলের একটি মন্ত্রে ঋষি বলেছেন — সকল নারীর মধ্যে আমি ইন্দ্রাণীকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে করি। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩/২২/৭) ইন্দ্রাণীর নাম প্রাসহা ও সেনা —'সেনা বা ইন্দ্রস্য প্রিয়া জায়া বাবাতা প্রাসহা নাম'। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও (১/৪/২/৭-৮) ইন্দ্রাণীর সঙ্গে এদের ঐক্য দেখান হয়েছে। ইন্দ্রাণীর নাম শচী বলেও কোথাও কোথাও দেখান হয়েছে। তাই ইন্দ্র হয়েছেন শচীপতি। বেদের অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীদের পরিচয় পিতা, স্বামী প্রভৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হলেও শচীপতির ক্ষেত্রে কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে সংযুক্ত করে ইন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত পিশেল সাহেব শচী শব্দটি নাম হিসাবে ধরলেও আধুনিক অনেক পণ্ডিত এর অর্থ করেছেন — শক্তির অধীশ্বর। পৌরাণিক সাহিত্যে ইন্দ্র নিঃসন্দেহে শচীপতি। শাক্তধারায় ইন্দ্রাণী ও শচী সমার্থক। ইন্দ্র এখানে চতুর্দন্ত গজারূঢ়। তাঁর হাতে আছে বজ্রনামক আয়ুধ। তিনিই পুরন্দর এবং নানা অলংকারে বিভূষিত —

''চতুর্দন্তগজারূঢ়ঃ বজ্রপাণিঃ পুরন্দরঃ।
শচীপতিশ্চ ধ্যাতব্য নানালঙ্কারভূষিতঃ।।''

নভঃ প্রভেদন নামক ঋষি ইন্দ্রের সুন্দর মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন। ইন্দ্র হরিৎবর্ণ ঔজ্জ্বল্যদ্বারা সূর্য্যের থেকেও উজ্জ্বলতর এবং নানা শোভার দ্বারা তাঁর শরীর বিভূষিত (ঋক্ সং ১০/১১২/৩)। তাঁর দেহটি হিরণ্ময় (ঋক্ সং ১/৭/২), তিনি হিরণ্যবাহু (৭/৩৪/৪) ও বিশাল হস্ত বিশিষ্ট (৮/৮১/১) — মহাহস্তী। তাঁর হস্ত দুটিকে বিস্তীর্ণ দানশীল ও কর্মক্ষম (ঋক্ সং ৯/১৯/৩) বলা হয়েছে। ইন্দ্রের শ্মশ্রুর প্রশংসায় ঋগ্বেদের অনেকগুলি মন্ত্র ব্যয় করা হয়েছে। রথে ছোটার সময় তাঁর শ্মশ্রু কাঁপে (ঋক্ সং ১০/২৩/১), সোমরস পানের সময় শ্মশ্রুতে সোম লেগে থাকে (ঋক্ সং ২/১১/১৭)। ইন্দ্রের বিশ্বরূপ ও নানারূপের কথা ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে শ্রুত হয়। তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করে অমৃতে অধিষ্ঠান করছেন (ঋক্ সং ৩/৩৮/৪) — 'বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ'। তিনি শরীরকে নানাবিধ রূপ বিশিষ্ট করেছিলেন (ঋক্ সং ৩/৪৮/৪) — 'যথাবশং তন্বং চক্র এষঃ'। 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব' (ঋক্ সং ৩/৫৩/৮)। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে রাজধর্মের আলোচনা করতে গিয়ে মনু বলেছেন রাজা তাঁর কার্যসিদ্ধির জন্য নানা প্রকার রূপ ধারণ করেন। রাজার মধ্যে ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ ইত্যাদি নানা দেবতা অবস্থান করেন। ইন্দ্রকে দেবরাজ হিসাবে কল্পনা করার ফলেই হয়তো তাঁর বিশ্বরূপ ও সহস্রাক্ষ এরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধেই আমরা এই দুটি বিশেষণ সম্পর্কে আলোচনা করব।

....ক্রমশঃ

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কোথায় তোমরা চলেছ?

(স্বামী মুক্তানন্দ রচিত ইংরাজী পুস্তক 'Where Are You Going' **-এর বঙ্গানুবাদ)**

(৫)

চেতনার চার অবস্থা —

রাজা জনকের মতন, আমরা কেবল একটা সাধারণ চেতন অবস্থাকে মানি, যার মধ্যে আমরা বাস করি। পূর্ণ সত্যের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নেই। যখন আমরা জেগে থাকি তখন আমরা সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত জগতের মধ্যে ডুবে থাকি। যখন আমরা স্বপ্নে থাকি, আমদের ক্রিয়াকলাপ, আমাদের জগৎ, আমাদের বোধ, জাগ্রত অবস্থার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যখন আমরা গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকি, আমাদের চেতনাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে হারাই। কিন্তু যখন আমরা ধ্যান করি, আমরা গভীর নিদ্রাকে ছাড়িয়ে আত্মার রাজ্যে প্রবেশ করি। সেই অবস্থা হচ্ছে অন্যান্য সব অবস্থার ভিত্তিভূমি। এইটাই কেবল স্থায়ী এবং অপরিবর্তনশীল। একবার এই অবস্থায় প্রবেশ করলে আমাদের সত্যকে বুঝতে পারব। আমরা অনুভব করতে পারব যে আমরা চৈতন্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই স্থূলদেহে আমরা যে বেশভূষা পরি তার মতন। বেশভূষাগুলি যেমন কেবল দেহের আবরণ মাত্র, সেইরকম, বাহ্যিক শরীরটা কেবলমাত্র আমাদের ভিতরের চৈতন্যের আবরণ মাত্র। সেই চৈতন্যকে জানাই হোল আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। যদি প্রত্যেকেই সেই অন্তঃসত্যকে উপলব্ধি করতে পারে, যদি প্রত্যেকে তাদের প্রকৃত স্বভাবকে বুঝতে পারে, তাহলে আর কখনো মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব থাকবে না; যেটা থাকবে সেটা হল মৈত্রেয়ী, ভালবাসা এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ। এই কারণে, আমাদের আত্মাকে জানা একান্ত প্রয়োজন। যখন আমরা আমাদের আত্মাকে জানতে পারব, তখনই কেবল অন্যকে জানতে পারব। তখনই, যে মহত্ব আমাদের মধ্যে অবস্থান করছে, অন্যের মধ্যেও সেই মহত্ব দেখতে পারব। যখন আমরা আমাদের মধ্যে মনুষত্বের সত্য সচেতনতা অনুভব করতে পারব, অন্যের মধ্যেও সেই একই মনুষত্ব দেখতে পাব এবং তখনই আমরা বুঝতে পারব যে পৃথিবীর প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান।

সুখের অন্বেষণে —

ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ একটা বড় প্রশ্ন তোলেন, ''মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য কি?'' ঋষিদের মত অনুসারে, দুঃখ, কষ্ট দূর এবং চরমতম আনন্দলাভ করাই জীবনের লক্ষ্য। এই বিষয়ে চিন্তা করলে আমরা বুঝতে পারব যে আমরা জীবনে যা কিছু করি এই দুইটির জন্যই।

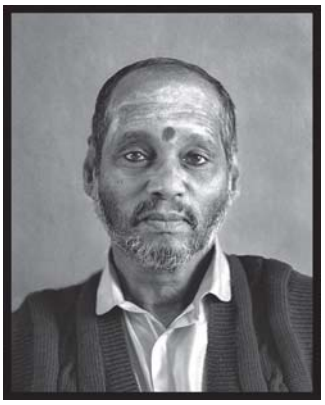

আমরা কী চাই? আমরা সুখ চাই। আমরা আনন্দ চাই। আমরা ভালবাসা, প্রেরণা ও উৎসাহ চাই এবং যে কোনো প্রকারেই হোক আমরা এগুলি লাভ করতে চাই। সুখের জন্য আমরা প্রেম করি এবং বিবাহ করি, সন্তান উৎপাদন করি। সুখের জন্যই আমরা ব্যবসা করি, অর্থ উপার্জন করি, সম্পদ সংগ্রহ করি এবং বিভিন্ন প্রকার মেধা দক্ষতা এবং উপভোগের পিছনে ধাবিত হই। এমনকি যখন অন্যের কোনো ক্ষতি করি বা অন্যকে বঞ্চিত করি, তখনও আমরা এগুলি করি এই আশায় যে এগুলি আমাদের সুখ আনবে। কিন্তু যদি আমরা যথার্থই নিজেদের বিচার করি তাহলে আমরা আবিষ্কার করব, যে আনন্দ আমরা খুঁজছি কেবলমাত্র আমাদের নিজেদের মধ্যেই খুঁজে পাব। মহারাষ্ট্রের একজন সাধক কবি লিখেছেন —

''হে মানব, বাইরের জগতে তো তুমি এত ঘুরলে,
এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটলে,
কত ফুল-ফল তুললে কত অসংখ্য কর্মের পিছনে ছুটলে,
কিন্তু এত সব করে শুধু দুশ্চিন্তাই লাভ করলে,
এখন সময় এসেছে সীমাহীন অন্তর্জগতে উড়ে যাবার।
তোমার অভিষ্ট বস্তু পূর্ণভাবে সেখানে পাবে।''

অন্তর্মুখ হওয়া এত দুরূহ কেন? আমরা সুখ চাই, কিন্তু আমরা ক্রমাগতই করে চলেছি দুঃখের সাধনা। আমরা দুঃখের বীজ বপন করে যাচ্ছি এবং সুখের ফল ফলতে না দেখলে আশ্চর্য হই।

আমি এক দেশ থেকে অন্য দেশ ভ্রমণ করেছি। বিভিন্ন প্রকার লোকেদের সাথে আমি মিশেছি। আমি ধনী ও দরিদ্র

উভয় প্রকার লোকের সঙ্গ করেছি এবং প্রত্যেকেই আমার কাছে একই কথা বলেছে। প্রত্যেকেই অসুখী। তবু এত অতৃপ্তি থাকা সত্ত্বেও তারা আগে যেমন ভাবে জীবন কাটাচ্ছিল এখনও তেমন ভাবেই জীবন কাটাচ্ছে। কেমন করে তারা তাদের দুঃখ কষ্টের মোচন করবে এই চিন্তা না করে তারা স্বামী বা স্ত্রীকে, ঊর্দ্ধতর কর্তৃপক্ষকে, সরকার অথবা তাদের সময়কে কেবল দোষারোপ ও অনুযোগ করে। তারা ভাবে, 'আমাকে যে ভালবাসত যদি তাকে পেতাম, আমি খুব সুখী হতাম। আমার যদি একটা ভাল চাকরি থাকত, আমার জীবনে কোনো কষ্ট থাকত না। আমি যেমন চাই, স্ত্রী যদি সেই মতন চলত, সমস্তই শান্তিপূর্ণ হোত'— এবং এইভাবেই তাদের দিনগুলি চলে।

অবিরত লঙ্কা খাওয়া —

একটা গল্প আছে, সেটা এই কথাটিকে ভারি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। একবার শেখ্ নাসিরুদ্দিন ভারত ভ্রমণে আসেন। যখন দিল্লী শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি একটা ফল ও তরি-তরকারির বাজারে আসলেন। বাজারে দাঁড়িয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন যে অনেকেই লঙ্কা কিনছে। ভারতীয়রা খাবার সময় লঙ্কা খেতে খুব ভালবাসে। তারা খায় খুব অল্পই। নাসিরুদ্দিন ভাবলেন এটা (লঙ্কা) নিশ্চয়ই খুব উপাদেয় খাদ্য। সেইজন্য তিনি দু-কিলো লঙ্কা কিনলেন ও একটা গাছের নীচে বসে খেতে লাগলেন। প্রথম লঙ্কাটা চিবাতেই তাঁর মুখ জ্বলতে আরম্ভ করল এবং তাঁর চোখ-নাক দিয়ে জল বের হতে লাগল। তিনি উঃ! আঃ! করতে থাকলেন ও মুখে হাওয়া করতে লাগলেন। তারপর আবার একটা লঙ্কা চিবাতে লাগলেন এই ভেবে যে এই লঙ্কার স্বাদ নিশ্চয়ই আরো ভাল হবে। যদিও তাঁর মুখ জ্বলতে থাকে তবুও তিনি একটার পর একটা লঙ্কা খেতে থাকলেন এই ভেবে যে পরের লঙ্কাটা নিশ্চয়ই আগের লঙ্কাটার চেয়ে স্বাদে ভাল হবে। আমরাও ঠিক নাসিরুদ্দিনের মতন। আমরা প্রত্যেকেই লঙ্কা খাচ্ছি এই ভেবে যে কাল যে লঙ্কাটি খাব, সেটা না হলেও তার পরের দিনের লঙ্কাটির স্বাদ নিশ্চয়ই ভাল হবে। আমরা প্রত্যেকেই অবিরত সেই লঙ্কাই খেয়ে যাচ্ছি এই ভেবে যে কোনোদিন কখনো এগুলি সুস্বাদু হয়ে উঠবে। কিন্তু যেটা হচ্ছে সেটা হোল বর্তমানে আমরা নাকের-জলে, চোখের-জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।

যখন নাসিরুদ্দিন তেজের সঙ্গে লঙ্কা খেয়ে চলেছেন, একটি লোক যে নাকি এতক্ষণ তাঁকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল, তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করল, সে কি করছে? নাসিরুদ্দিন বললেন, ''আমি দেখলাম অনেক লোকে এই জিনিসটি (লঙ্কা) কিনছে। সেইজন্য আমিও কিছু কিনলাম ও খাচ্ছি'' লোকটি বলল, ''দেখ এগুলি লঙ্কা। এগুলি খুব সামান্য পরিমাণে খেতে হয়।'' নাসিরুদ্দিন মাথা ঝাঁকালেন এবং পুনরায় খেতে লাগলেন। লোকটি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল, ''এখন তো তুমি এগুলি কি জেনেছ, তবুও তুমি খাওয়া থামাচ্ছ না কেন?'' নাসিরুদ্দিন বললেন, ''দেখ, আমি এই লঙ্কাগুলি কিনেছি এবং আমাকে এগুলি শেষ করতেই হবে কারণ আমি আর লঙ্কা খাচ্ছি না আমি আমার টাকা খাচ্ছি।''

এই ভাবেই আমরা আমাদের জীবন কাটাই। আমাদের পারিপার্শিক পরিস্থিতি যদিও খুবই উত্তপ্ত সমস্যাপূর্ণ কিন্তু এগুলি আমাদের গ্রহণ করতেই হয় কারণ এগুলি আমরাই সৃষ্টি করেছি। আমরা আরও বেশী মজা উপভোগ, আরও প্রিয়জন বন্ধুবান্ধব, আরও অর্থ, আরও যশ খুঁজি। কিন্তু এগুলি কি সত্যকারের তৃপ্তি দিতে পারে? এইসব উপভোগ্য কি আমাদের সত্যকারের আনন্দ দিতে পারে, না কেবলই এগুলি আমাদের মধ্যে শুষ্কতা এবং রুক্ষতা আনে? সত্য সত্যই কি আমরা পরম আনন্দের অন্বেষণ করছি?

কবি ভর্তৃহরি লিখেছেন : ''আমি ভাবি আমি ইন্দ্রিয়গত আনন্দ উপভোগ করে যাচ্ছি, আমি বুঝতে পারি না তারা আমাকেই উপভোগ করে।

আমি ভাবতাম, আমি সময় কাটাচ্ছি, আমি বুঝতাম না যে এটা আমাকেই কাটাচ্ছে।

তোমার জীবনের দিকে তাকাও, চোখ খোলো, যখন তুমি তোমার কামনা বাসনা মেটাবার চেষ্টায় রত, তখন মহাকাল তোমাকে খেয়ে ফেলছে।''

কামনার ধর্মই হচ্ছে বেড়ে যাওয়া। যতই আমরা আমাদের বাসনাকে মেটাতে যাই, ততই সেগুলি বেড়ে যায়। আমাদের কী আছে পৃথিবীতে, সেটা বড় কথা নয়, আমরা সর্বদাই আরও বেশী চাই। আমাদের এক টাকা থাকলে, আমরা দশ টাকা চাই। যদি আমাদের দশ টাকা থাকে আমরা একশ টাকা চাই। যদি আমাদের ভক্স-ভ্যাগন্ গাড়ি থাকে আমরা মারসিডিস্ গাড়ি চাই। যদি আমরা একপাত্র খেতে পাই তাহলে আর এক পাত্র চাই। কিন্তু যতক্ষণ না আমরা অন্তর্মুখী হই এবং আত্মার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারি, ততক্ষণ আমাদের কামনা বাসনার শেষ হবে না তা আমারা যত টাকাই উপার্জন করি বা

যত বন্ধু-বান্ধব লাভ করি বা নানারকম কর্ম সম্পাদন করি না কেন। বাইরের এই পৃথিবীর সমস্ত আনন্দই ক্ষণস্থায়ী। তারা স্থায়ী হতে পারে না। বস্তুতঃ আত্মার আনন্দ বাদে আমাদের পার্থিব আনন্দ, কোনো সংখ্যা বিহীন শূন্যের সমষ্টির মতন। যদি কেউ সেই আনন্দের মূল্য নির্ধারণ করতে চায় তাহলে তা সেই সংখ্যাবিহীন শূন্যের সমষ্টির মতই অর্থহীন হবে। আত্মার আনন্দ বাদে আমাদের সম্পদ শূন্য, রূপ শূন্য এবং আমাদের সব কর্মই অর্থহীন। যখন কেবল আমরা আত্মার অমৃতসুধা পান করি, তখন আমাদের সব শূন্যের কিছু মূল্য হয়।

...ক্রমশঃ

—বঙ্গানুবাদ শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

ভ্রমণ

পঞ্চকেদারের পথে পথে

(৩)

তৃতীয় কেদার তুঙ্গনাথ যাত্রাপথে প্রথমে মদমহেশ্বর থেকে ফিরতি পথ। গৌভারে সামান্য বিশ্রাম সেখান থেকে রাঁশু হয়ে লেঙ্ক, এই লেঙ্কেই এদিনের মতো যাত্রা বিরতি। পরদিন সকালে লেঙ্ক থেকে যাত্রা শুরু, মনসুনা গ্রাম। পাঁচ কিলোমিটার পথ। সেখান থেকে বাসে উখীমঠ। এই পথে বাস চলাচল দিনে দুবার। আমার কপাল ভালো বলতে হবে। মনসুনা গ্রামের শেষ প্রান্তে পিচঢালা রাস্তায় পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই বাসের দেখা মিলল। মনসুনা থেকে উখীমঠ আট কিলোমিটার। বাস না পেলে দ্বিতীয় বিকল্প পথচলতি কোনো সরকারি জিপ কিন্তু তা বড়ই অনিশ্চিত। উখীমঠ প্রাচীন রাজধানী, রাজকন্যা উপদেবীর নাম অনুসারে স্থানের নাম। মদমহেশ্বরের শীতকালীন আবাসন। পাহাড়ঘেরা উখীমঠের প্রাকৃতিক পরিবেশের তুলনা নেই। এখানে ব্যাঙ্ক, পোষ্ট-অফিস, বাজার, দোকান, স্কুল, হোটেল সবই আছে। রাত্রিযাপনের কোনো অসুবিধা নেই। উখীমঠ থেকে গোপেশ্বরের বাস ধরে নামি চোপতায়। উচ্চতা ১০ হাজার ফুট। চোপতা তুঙ্গনাথের প্রবেশদ্বার। উখীমঠ থেকে চোপতা প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার। রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে চামোলীতে — কেদার ও বদ্রীর সংযোগকারী পথ। চোপতা থেকে তুঙ্গনাথ চার কিলোমিটার। সময় বিকেল চারটে। ইচ্ছা তুঙ্গনাথেই রাত্রিযাপনের, সেইমতো বাস স্ট্যাণ্ডেই সামান্য কিছু মুখে দিয়ে যাত্রা শুরু করি। প্রথমে কিছুটা জঙ্গলের পথ, তারপর ন্যাড়া পাহাড়, পাহাড়ের গা বেয়ে পথ, বাঁ হাতে খাদ। হঠাৎ সূর্যদেব মুখ ঢাকেন। পাহাড়ীপথে নেমে আসে অন্ধকার। হেড-ল্যাম্প জ্বালিয়ে নিই। রাতের অন্ধকারে হিমালয় যেন জেগে ওঠে। গভীর নীরবতারও যে একটা ভাষা থাকতে পারে তা আগে বুঝিনি। হিমালয় যেন এগিয়ে আসে আরও কাছে। ফিসফাস শব্দে প্রকৃতিও যেন কিছু বলতে চায়। নিঃশ্বাসের শব্দে বনদেবীর যেন ধ্যানভঙ্গ হয়। গুরুমায়ের নাম নিয়ে চলতে শুরু করি। হঠাৎ দূর থেকে হোও-ও শব্দ সঙ্গে টর্চের আলোর রেখা। খুব দ্রুত এগিয়ে আসে আলোটা। দেখি আমারই দিকে ছুটে আসছে ওই আলো। কাছে আসতে দেখি লাগপৎ। জানতে পারি তুঙ্গনাথের পূজারীজী পাঠিয়েছেন তাকে আমার হেড-ল্যাম্পের আলো দেখে। লাগপতের সঙ্গে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াই মন্দির প্রাঙ্গণে। হাসিমুখে অভ্যর্থনা করেন পূজারীজী। যাত্রীনিগমে স্থান মেলে। কিছু পরে বের হই তুঙ্গনাথ দর্শনে। পুজারীজী জানান রাত্রে মন্দিরপ্রাঙ্গণে থাকার উপায় নেই। তুঙ্গনাথ রুষ্ট হন। লাগপৎ শোনায় এক কাহিনী। একবার জনৈক যাত্রী তুঙ্গনাথে আসেন, তিনি ভালো করে চলতে পারতেন না কুলীরা তাঁকে যাত্রীনিবাসে রেখে যায়। রাতের অন্ধকারে তিনি কোনো রকমে উপস্থিত হন মন্দির প্রাঙ্গণে, সকলের নিষেধ অমান্য করে, বলেন -"এই জীবন রেখে কি লাভ। যদি মরতেই হয় তুঙ্গনাথে এসে মরাই ভালো।" অনেক বোঝানোর পরেও তিনি সবাইকে ফিরিয়ে দিয়ে একা রয়ে যান মন্দির প্রাঙ্গণে। রাতের অন্ধকারে

উখীমঠ

তুঙ্গনাথের কাছে তাঁর আকুতির শব্দ শোনা যায়। হঠাৎ সেখানে আবির্ভূত হন এক জটাধারী সন্ন্যাসী, হাতে ত্রিশূল। ওই যাত্রীকে সবেগে পদাঘাত করেন তিনি। বলেন তক্ষুণি সেখান থেকে চলে যেতে। সন্ন্যাসীর রুদ্ররূপ দেখে দৌড়ে যাত্রীনিবাসে পালিয়ে আসেন তিনি। তাঁর চিৎকারে বেরিয়ে আসেন পূজারীজী, লাগপৎ ও আরও অনেকে। ওই যাত্রীর মুখেই শোনেন সব। সবাই মিলে আবার যান মন্দিরে, কিন্তু কোনো সন্ন্যাসীকে কেউ দেখতে পান না।

তুঙ্গনাথ মন্দির

হঠাৎই পূজারীজীর টনক নড়ে, ওই যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন - ''আপনিতো ভালো করে চলতেও পারেন না। মন্দির থেকে দৌড়ে যাত্রীনিবাসে গেলেন কি করে?'' পূজারীজীর কথায় সবার সম্বিত ফেরে, ঠিকই তো! নিজেই নিজের অবস্থা দেখে বিহ্বল হয়ে যান ওই যাত্রী। জানান সন্ন্যাসীর পদাঘাতে তাঁর পঙ্গুত্ব সেরে গিয়েছে। তিনি কারোর সাহায্য ছাড়াই চলতে পারছেন, দৌড়াতে পারছেন। দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নামে তাঁর। বারবার বলেন - এ তুঙ্গনাথেরই কৃপা। সন্ন্যাসীর বেশে উনিই এসে তাঁকে সুস্থ করে গিয়েছেন।

ফিরে আসি যাত্রীনিবাসে। আকাশে প্রায় পূর্ণ চন্দ্রমা। আলোয় ভেসে যাচ্ছে তুঙ্গনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ। রাত প্রায় এগারোটা। পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াই মন্দির প্রাঙ্গণে। না, তুঙ্গনাথকে বা সেই সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়ার আশায় নয়, রাতের তুঙ্গনাথকে প্রত্যক্ষ করতেই আসা। সচকিত হয়ে দেখি মন্দিরের দালানের দুধারে দুই ব্যক্তি বসে আছেন। দুজনের হাতেই ঝকঝক করছে স্ফটিকের মালা। আমিও বসি দরজার মুখোমুখি। দুজনেই একটু যেন অসন্তুষ্ট হন। হঠাৎ দুজনেই বলে ওঠেন, ''কি চাই এখানে? যা চলে যা!'' বলতে বলতে দুজনেই আমার দিকে ছুঁড়ে দেন দুই স্ফটিকের মালা। আমি বলি, ''ওতে আমার লোভ নেই। নিজেদের মালা নিয়ে যাও তোমরা।'' আমার সঙ্গে আমার গুরুমা আছেন। ভয় কি! দুই সাধকের একজন অপরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ''আজ এই ছেলেটির জন্য তুই বেঁচে গেলি। আজ যদি এই ছেলেটি আমাদের মধ্যে এসে না পড়ত তবে তোকে দেখাতাম আমার শক্তি।'' আমি হেসে ফেলি। প্রকৃতির শক্তির কাছে নিজের শক্তির জাহির করার কথা শুনে না হেসে থাকতে পারিনি। আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে নিজের মালা তুলে নিয়ে মন্দির চত্তর থেকে বেরিয়ে যান তিনি। অপরজন কিছু বলেন না। শুধুই নীরব দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন তুঙ্গনাথের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে তিনিও চলে যান মন্দির ছেড়ে। হঠাৎ কারোর স্পর্শে চমকে উঠি, দেখি পূজারীজী। বলেন - ''আপনি ভাগ্যবান। আপনার গুরু-কৃপায় এযাত্রা রক্ষা পেয়েছেন, ঘরে চলুন''— কিন্তু কিসের বিপদ, কার থেকে রক্ষা কিছুই ভাঙেন না তিনি। ঠাণ্ডা বাড়ছে, ফিরে আসি যাত্রীনিবাসের ঘরে। পরদিন ভোরেই ঘুম ভাঙে। ভোরের আলোয় প্রকৃতির অঙ্গসজ্জা তুলনাহীন। লাগপৎকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাই চন্দ্রশীলার দিকে। উচ্চতা ১৪০০০ ফুট। তুঙ্গনাথ থেকে দূরত্ব এক কিলোমিটার। গোটাপথ বরফে ঢাকা। নানা আকৃতির বরফ। কোথাও শক্ত, কোথাও কাঁচের মত ধারালো, আবার কোথাও নরম। বরফের শুভ্র গালিচা পেরিয়ে এসে দাঁড়াই এক ডিম্বাকৃতি খাবার টেবিলের আকৃতির সমতল প্রান্তরে। লাগপৎ নীচু হয়ে কয়েকটি ঘাস তুলে আনে। ওই ঘাসের মূলে সুমধুর গন্ধ। প্রতি বছর 'বায়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'-র ছাত্র-ছাত্রীরা আসে চন্দ্রশীলায় হিমালয়ের উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করতে।

তুঙ্গনাথে মহাদেবের বাহু প্রসারিত। গর্ভগৃহে লিঙ্গমূর্তি। লিঙ্গমূর্তির পিছনে শঙ্করাচার্যের তৈলচিত্র। বাঁপাশে কালভৈরব, ডানদিকে ঋষি বেদব্যাস। সামনে পঞ্চকেদারের শিলামূর্তি। মন্দির পাথরের তৈরী, চূড়ায় তামার পাত্রে সোনার প্রলেপ। মন্দিরের সামনে পাথর বাঁধান উঠোন। একপাশে পাঁচ মূর্তি — ঈশ্বরীমাতা, বিষ্ণুভগবান, গৌরীশঙ্কর ও ভৈরবনাথ। অপর দিকে পূজারীর আবাসন ও তুঙ্গনাথের ভাণ্ডার ঘর।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীসৌরভ বসু

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৫৩ : সঙ্গীতের মাধ্যমে কি সত্যদর্শন, ঈশ্বরদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন লাভ হওয়া সম্ভব?

উত্তর : শুধুমাত্র স্বর সাধনার মাধ্যমে নাদ সাধনা করিলেও তাহার সঙ্গে আত্মজ্ঞান লব্ধ হইবার জন্য ব্রহ্মবিদ্যারূপী যোগবিদ্যা সাধনের প্রয়োজন আছে। শুধুমাত্র সঙ্গীতজ্ঞ হইলেই চলিবে না, আত্মজ্ঞও হইতে হইবে। তবেই ভক্তি ভাবের উন্মেষ হইবে এবং ঈশ্বর-দর্শন বা সত্যদর্শন সম্ভব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অন্তরে নাদব্রহ্মের স্ফুরণ হয় ততক্ষণ সাধকের মন বহির্মুখীন অবস্থায় অবস্থান করিয়া থাকে। মন অন্তর্মুখীন হইলে পরে সঙ্গীতের প্রত্যেকটি স্বরে নাদের বিশুদ্ধ শব্দের প্রকাশ হয়, যাহার ফলে হৃদয় আন্দোলিত হয় এবং সুন্দর বিশুদ্ধ ঈশ্বরীয় ভাবের খেলা তখন সাধক-অন্তরে চলিতে থাকে। সেই শুদ্ধভাবেই যখন সাধকচিত্ত আত্মায় যোগযুক্ত অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকে এবং এই অবস্থা যখন স্বভাবসিদ্ধ হইতে থাকে তখন সেই সাধকের সঙ্গীতও চিন্ময় বিশুদ্ধ স্বরান্বিত হইয়া কণ্ঠ দিয়া নির্গত হইতে থাকে। আত্মজ্ঞানী যোগীর কণ্ঠ দিয়া মধ্যমা-পশ্যন্তী বাকের স্ফুরণ হয় এবং সেই সঙ্গীত শ্রোতৃমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ ও তন্ময় করিয়া দেয়।

আত্মজ্ঞানী যখন শিবাবস্থা লাভ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী হন, তখন পরাভক্তির প্রকাশে আপ্লুত অবস্থায় তিনি যখন পরমেশ্বরকে গীত শোনান তখন পার্শ্ববর্তী ভক্তগণ যাঁহারা সেখানে উপস্থিত থাকেন তাঁহারাও সেই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ও ছন্দের সুরতরঙ্গে সেই সময়ে ঈশ্বরের চিন্ময় প্রসাদ লাভ করেন। অনুভবী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞ যদি প্রকৃত ভক্ত হন এবং তিনি যদি ধ্যানযোগ-সাধক হন তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রাগরাগিনীর মাধ্যমে বহু অতীন্দ্রিয় অনুভূতি করিতে সক্ষম হন। উচ্চাঙ্গ পর্য্যায়ের সর্বপ্রকার কলাবিদ্যার মধ্যেই ঈশ্বরের সত্যের চিন্ময়ত্বের মহিমার বিরাট প্রকাশ নিহিত থাকে। তখন সাধকযোগীর সেইসব উপলব্ধি হয় আর যাঁহারা দিব্যের সাধনা করেন, তাঁহাদের কণ্ঠে সঙ্গীতও দিব্য হইয়া ওঠে। দিব্য সাধকের সঙ্গীত শোনার সময় অন্য ভক্ত সাধক-সত্তার কূটস্থে গগন মণ্ডলে চিন্ময় জ্যোতি দর্শন হয়।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

সন্তোষ ও সমর্পণ

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তি যোগ, চতুর্দশ শ্লোক —

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যৎ-আত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।"

যিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে এবং সম্পদ বা বিপদে সর্বদা সন্তুষ্ট থেকে ভগবানে নিবিষ্ট চিত্ত, যিনি ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন এবং যিনি সঙ্কল্প-বিকল্প ছাড়িয়া মন ও বুদ্ধিকে ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, এইরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয়।

মানুষ কি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে, সম্পদ-বিপদে স্থির চিত্ত সন্তুষ্ট হয়ে থাকতে পারে? মানুষ কি সঙ্কল্প-বিকল্প ছেড়ে মন ও বুদ্ধিকে ভগবানের চরণে সমর্পণ করতে পারে? দুটি প্রশ্নের উত্তরে মানুষ বলবে - "গীতা পাঠ করতে বা শুনতে ভাল লাগে। পাঠ করলে বা শুনলে নিজেকে বেশ ভক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু সত্যি বলতে কি জীবনে এসবের প্রতিফলন একদমই করা যায় না এবং প্রতিফলিত করতে না পারার কারণ কি তাও সঠিকভাবে বলা যায় না।"

ঐ যে বলা হয়েছে না, "যৎ-আত্মা দৃঢ় নিশ্চয়", এখানেই যত গোল অর্থাৎ, আত্মাতে বা ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস নেই। তাই বেদান্ত সর্বপ্রথম আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, "আগে নিজেকে বিশ্বাস কর।" বেশীরভাগ মানুষই নিজেকে বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের উপর ভরসা নেই। ভাবে এক, করে এক। দৃঢ়চেতা হয়ে উঠতে পারেনা। সবকিছু পাওয়ার জন্য দিন-রাত এক করে ফেলে কিন্তু নিজেকে জানার জন্য যে জেদ তা একবিন্দুও নেই। সব সময়ই ভাবে যখন হাতে সময় থাকবে তখন এ ব্যাপারে ভেবে দেখা যেতে পারে।

কখন প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে সমভাব হওয়া যায়? "তস্মাৎ সক্তঃ সততং কর্ম সমাচারে।" যখন প্রবলভাবে কর্তব্য কর্ম করা সত্ত্বেও মনে কর্মফলের আশা জাগবে না। কর্মের অধিকার মানুষ মাত্রই আছে এবং তা মানুষের হাতেই, কিন্তু কর্মফল যা ভবিষ্যতে ফলবে তা মানুষের হাতে নেই। এই বিষয়টা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। ফলে প্রাপ্তিতে আনন্দ এবং অপ্রাপ্তিতে নিরানন্দ ভোগ করে থাকি। কিন্তু

গীতায় ভগবান বলেছেন -''ভক্ত, যিনি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত (এখানে যুক্ত অর্থে যোগ বোঝানো হয়েছে, অতএব প্রকৃত ভক্ত অর্থে যোগী) তিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে সতত সন্তুষ্ট থাকবেন।''

মানুষ প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু সঙ্কল্প-বিকল্প করে। এই মুহূর্তে ভাবলো এটা করবো, ওটা করবো, পরমুহূর্তে ভাবনা পাল্টে গেল। এটা না করলেও চলে, ওটা না করলেও চলে। আবার কখনও কখনও এমন সঙ্কল্প করল যে- ''ঐ বস্তুটি আমার চাই, আমাকে ওটা পেতেই হবে।'' প্রাপ্তির আশায় দিন দিন মনে চাপ বাড়তে থাকল। কতই না সমস্যা ঠেলে প্রচুর বুদ্ধি ব্যয় করে বেশ কিছু দিনের কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্টায় যখন বস্তুটি পেল তখন অল্প কিছুক্ষণ ভোগ করে মনের চাপ কমিয়ে ফেললো; পুনরায় শুরু হল নতুন কিছু পাওয়ার কামনা। যথারীতি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কিন্তু ভগবান বলছেন - ''তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত যিনি এইরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প ছেড়ে মন ও বুদ্ধি আমাতে সমর্পণ করেন।''

একদা এক সাধু একটি ছোট্ট পাহাড়ের (টিলার) উপর থাকতেন। তাঁকে সবাই পাগলা বাবা বলতো। তিনি নিত্য সূর্য্য ওঠার পর ভোর পাঁচটার সময় ঐ টিলার উপর থেকে নীচে নেমে একটা বড় পাথরকে ঠেলে ঠেলে ভোর থেকে বিকাল পর্য্যন্ত প্রায় দশ-বারো ঘন্টার চেষ্টায় ও বহু পরিশ্রমে পাথরটিকে টিলার উপর তুলতেন। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ঠিক সূর্য্য অস্ত যাবার মুহূর্তে টিলার উপর থেকে পাথরটিকে নীচের দিকে ঠেলে দিতেন আর পাথরটি গড়াতে গড়াতে দু-এক মিনিটের মধ্যে সমতলে গিয়ে পড়তো। সাধুটি তখন টিলার উপর দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে নেচে উঠতেন। পরদিবস সাধুটি আবার একটা পাথর সংগ্রহ করে ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতেন। তাই সেখানকার লোকেরা সাধুটিকে পাগলা বাবা বলতো।

এই কাহিনীর তাৎপর্য্য কি? আসলে সাধু বাবা মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করতেন যে তোমরা প্রয়োজনের মাত্রাতিরিক্ত কামনা, বাসনাজাত প্রাপ্তি ও ভোগের নিমিত্তে নিত্য বহু কষ্ট ও পরিশ্রম করছো। খেয়াল করে দেখ প্রাপ্তির পর আনন্দ ও সুখভোগটা করছো খুব অল্প সময়ের জন্য। তারপর আবার একটা নতুন কামনার আশায় পূর্ণ উদ্যমে লেগে পড়ছো। সারাটা জীবন মন এইভাবে তোমাদের সঙ্গে ছলনা করে চলেছে, তাই তোমরা ইহলোকে ও পরলোকে চিরস্থায়ী সুখ ও আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হবার মতো মনকে তৈরী করে ভগবানের চরণে অর্পণ করতে পারছো না।

গভীরভাবে ভাবলে বোঝা যায় সমস্যাটা বস্তু বা ব্যক্তিকে নিয়ে নয়। সমস্যাটা অজ্ঞানতার ফলে মনের অহেতুক চাহিদা। ধরা যাক, বস্তুটা যদি সুরা হয় এবং সুরা যদি আনন্দদায়ক হয় তাহলে সমস্ত ব্যক্তির কাছেই তা আনন্দদায়ক হোত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সুরা কাহারও কাছে আনন্দদায়ক, আবার কাহারও কাছে বেদনাদায়ক। তাহলে আনন্দ বা বেদনার জন্য বস্তুটি দায়ী নয়। দায়ী মানুষের মন। আবার একই পিতা-মাতার দুটি সন্তান সমান গুরুত্ব ও সুখ-সুবিধা পেয়ে পিতা-মাতার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী বড় হতে লাগল। ভবিষ্যতে দেখা গেল দুজন দুরকম হল। পিতা মাতার ইচ্ছা কি পূর্ণ হল? দুই সন্তানের কাছ থেকে প্রাপ্তির আশা মনমতো না হওয়ায় আশাহত হয়ে দুঃখ প্রাপ্তি ঘটল।

এই মর্ত্যলোকে যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ জীবনধারণের জন্য কিছু না কিছু ভোগ তো করতেই হবে। কিন্তু কতটা ভোগের প্রয়োজন অর্থাৎ ভোগের মাত্রাটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মনের উপর। সত্যি কথা বলতে কি এই দুনিয়া থেকে কোন মানুষই কখনও সুখ পায় না। কেহ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য খাদ্য খুঁজছে, আবার কেহ ক্ষুধা পাবার উপায় খুঁজছে। কোনও মানুষই সুখী নয়। দুনিয়াকে আঁকড়ে ধরতে গেলে দুনিয়া দূরে সরে যায়, আবার দুনিয়াকে ছেড়ে দিতে চাইলে দুনিয়া পেছনে দৌড়ায়। এই হচ্ছে মন বা মায়ার ভেল্কি, কুহক। বিবেক ও বুদ্ধি সহায় যদি রজঃগুণী মনকে অতিরিক্ত চাহিদা ও ভোগ বিলাস থেকে একবার সরিয়ে আনতে পারা যায় তাহলেই মন ক্রমশঃ সত্ত্বগুণী হয়ে ওঠে। কিন্তু সরিয়ে আনার উপায় কি? উপায় একমাত্র সমাজ-সংসারের কর্তব্য কর্মের প্রতিদান আশা না করে সেবা মনোভাবে কর্তব্য কর্ম করে যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধু সঙ্গ, নিয়মিত সৎসঙ্গ ও সাধনা দ্বারা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চেষ্টা করা অর্থাৎ মনকে একটু ঊর্ধ্বমুখী করে রাখা, তবেই এই দুনিয়ায় কিছুটা সুখ-শান্তির মুখ দেখা যেতে পারে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিষেশতঃ সংসারের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে মানুষ সংসারকে আঁকড়ে ধরে তাতেই ডুব দেয় এবং জীবনটা দমবন্ধকর অবস্থায় কাটায়। প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধটা এখানেই। জীবন নামক যুদ্ধক্ষেত্রের দুটি পথ - শ্রেয় ও প্রেয়ঃ। ভগবান অর্জুনকে শ্রেয়র পথ ধরতে বললেন।

''যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণো-অন্যত্র লোকো-অহং কর্ম্মবন্ধনঃ।'' মনুষ্যগণ ভগবৎ আরাধনার কর্মকে সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র সমাজ-সংসারের স্বার্থজনিত কর্ম অনুষ্ঠানে ডুবে থাকে, ফলে মারাত্মকভাবে কর্ম বন্ধন দশাগ্রস্ত হয়।

ভগবানের প্রকৃত ভক্ত হতে হলে নিত্য মনকে জ্ঞান-বিবেকের চাবুক দ্বারা বোঝাতে হবে। অগ্নির দ্বারা দুগ্ধ মারলে যেমন ক্ষীর হয়, তেমন জ্ঞান-বিবেকের মারে মন ক্ষীরে পরিণত হয়। তখন অন্তরমুখী ঘনীভূত মন ভগবানের চরণে সমর্পণ করা সম্ভব হয়। এইরূপ ঘনীভূত সত্ত্বগুণী মনে আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয়। নিজের উপর অর্থাৎ আত্মা বা ভগবানের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ফলে বিশ্বাসী মন সহজেই একাগ্র হয়ে আত্মদর্শন করে। এইরূপে ভক্ত ভগবানের প্রিয় হয়ে ওঠে।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীতাপস বন্দোপাধ্যায়

গীতা ভাবনা

(৩৯)

গীতা ও ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্ব :—

(*...পূর্ব প্রকাশিতের পর*)

শ্রীঅরবিন্দ সহিংস নীতির পক্ষে গীতাকে স্থাপন করে বক্তৃতার মাধ্যমে তরুণদের উৎসাহিত করতেন। লোক-সংগ্রহের জন্য তথা ধর্মসংস্থাপনের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি সংগ্রাম করা হয় তাহলে সেই কর্মবীরকে পাপ-পুণ্য স্পর্শ করতে পারে না। গীতার ভাষায়—

'ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা।।'(৫/১০)

যার মধ্যে কর্তৃত্বের অভিমান নেই, যার বুদ্ধি কর্মফলে আসক্ত নয় সে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করলেও তাকে হত্যা বলা যাবে না। তাই হত্যা কর্মের ফলে তাকে আবদ্ধ হতে হয় না। এই উৎসাহ বাণী যে গীতাতেই আছে তা অরবিন্দ দেখিয়েছেন—

'তস্মাৎ অসক্ত সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।।'(৩/১৯)

গীতার মন্ত্রে এরূপ ব্যাখ্যায় বিপ্লবী তরুণেরা এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতেন যে দেশের জন্য ডাকাতি, লুঠ, হত্যা প্রভৃতি কাজে তাঁরা পিছপা হতেন না। গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' বাণী বিপ্লবীদের মুখে মুখে ফিরত। নিষ্কাম কর্মযোগের কথা তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে বোঝাতেন। নলিনী কিশোর গুহ 'বাংলার বিপ্লববাদ' গ্রন্থের ২৫৭ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ে যা লিখেছিলেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য —

''পাপ-পুণ্য সুতরাং স্বর্গ-নরকের কথা উঠিবামাত্র 'ক' 'খ'-কে ভক্তমালের উপাখ্যান শুনাইতে লাগিলেন। জান তো, শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য তেমন যে ভক্ত, সে আনন্দে চুরি করিয়া ঠাকুরের সেবার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। ভগবানের জন্য যদি ধর্মই ত্যাগ করিতে না পার, তবে ত্যাগ করিলেই বা কি? দেশসেবা যে ভগবৎ সেবা — এবার 'খ'-এর চিত্ত নরম হইতে লাগিল, 'ক' বিশিষ্ট কর্মী তাহার জ্বলন্ত বিশ্বাসের কাছে 'খ' নিজেকে যেন স্থির রাখিতে পারিতেছে না। তারপর 'ক' আরও বলিতে লাগিলেন - জান এক ভক্ত যখনই শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করিতেন, তখনই পূর্বে তাহা খাইয়া দিতেন। একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন, 'ওকি করিতেছ! ঠাকুরের ভোগ, যাহার উপর শ্বাস ফেলিতে নাই, দৃষ্টিও দিতে নাই, সেই পবিত্র বস্তু তুমি আগে খাইয়া উচ্ছিষ্ট করিতেছ? তোমার যে নরকেও স্থান হইবে না। ভক্তটি উত্তর করিল, আহা! তবু আমার ঠাকুর তো ভাল জিনিস খাইলেন, আমি নরক স্বর্গ চাহি না, আমি চাহি আমার ঠাকুরের সেবা। আমি না খাইলে, কেমন করিয়া জানিব? যদি ঠাকুরের মুখে খারাপ ভোগ যায়? আমাকে নরকে কি করিবে! ঠাকুরের ভোগ হইলেই হইল। ইহার পর আর কথা চলে না। 'খ'- এরও চলিল না—এ পথে তো ছিলই তাই মুক্তিই সার হইল—এই বিশ্বাসেই সে এ পন্থায় পা দিল। সত্যই ভাবিল তাই তো আমার অহংকারই তো আমায় বাধা দিতেছে। বিশিষ্ট কর্মীরা এই ভাবের যুক্তি দিতেন, অনেকের চরিত্রও তেমন নিষ্কাম ছিল।''

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'প্রভাব' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে ডঃ উজ্জ্বলা কুণ্ডু বিপ্লবীদের জীবনে গীতার প্রভাব বিষয়ে আরো অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তীকালে বাংলার বিপ্লবীরা দেশের জন্য আত্মদানে ব্রতী হয়েছিলেন। প্রথম বাঙালী শহিদ হলেন ক্ষুদিরাম বসু। মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হল। ফাঁসির মঞ্চেও তাঁর প্রফুল্লতার কথা তখনকার পত্র পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে বের হয়েছিল। সেই দৃঢ়তার ও আনন্দময়তার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে গবেষিকা বলেছেন 'মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া অমর জীবনে অটুট আস্থা

রাখিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুবরণ করিবার উৎস কোথায়?'

'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ।।
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ।।
অব্যক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে।'

—গীতা ২/২৩-২৫

গীতার এই বাক্য তাঁরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতেন বলেই সম্ভব হয়েছিল। গ্রাম্য চারণ কবি ক্ষুদিরাম যে গানটি রচনা করেছিলেন তার মধ্যেও আত্মার অবিনশ্বরতার, আনন্দে মৃত্যুবরণ এবং 'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ' এই চিরন্তন নিঃশোক বাণী উদ্‌ঘোষিত।

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।'

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও কানাইলাল বাংলার বিপ্লবী কুলজীতে দুইটি অমর নাম। তাঁদের ফাঁসীতে মৃত্যুবরণের যে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে তা মৃত্যুঞ্জয় সাধকের অমর দৃষ্টান্ত। কানাইলাল ছিলেন গীতার স্থিতধী। তাঁর মধ্যে ছিল বিস্ময়কর আত্ম-সমাহিত শক্তি। ফাঁসীর আদেশ হয়েছে। ফাঁসীর সেল-এ বন্দী কানাইলালকে দেখে আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন, 'একটি পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ দেখিলাম। বীতরাগ ক্রোধা শুভাশুভের প্রতি সমচিত্তবৃত্তি সম্পন্ন এই নরসিংহের চিত্তের অধিষ্ঠান কোথায় তাহা সহজেই অনুমেয়।' *...ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আশ্রম সংবাদ

১৬ই জুলাই — গুরুপূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ

অনুষ্ঠানের পর সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন দেন ও কিছু আধ্যাত্মিক কথা বলেন। এরপর হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যাটি, বাংলা বই 'ভক্তসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে' ও 'কবীরজী কে ভজন' নামক সিডি প্রকাশিত হয়। অন্তিমে একটি সুন্দর সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন আশ্রমের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীগণ।

২৪শে আগষ্ট — শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী তিথিতে শ্রীশ্রীরাধামাধবের দ্বিপ্রাহরিক ভোগ নিবেদিত হয়। এই পুণ্য তিথিতেই পূজণীয় শ্রীশ্রীবাবার জন্মতিথি। এইদিন সন্ধ্যায় শিশু শিল্পীদের মধ্যে নৃত্য প্রদর্শন করে আদ্যা সেঠিয়া, কাব্যা সেঠিয়া ও সমাদৃতা বসু এবং কবিতা আবৃত্তি করে তীর্থ সাহা। তৎপরে শ্রীশ্রীমা কৃষ্ণকথাসহ কৃষ্ণের বাললীলার ভজন পরিবেশন করেন।

১লা সেপ্টেম্বর — এইদিন আশ্রমে শ্রীশ্রীরামদেব বাবার পূজা হয়।

২রা সেপ্টেম্বর — গণেশ চতুর্থীর পবিত্র তিথিতে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীগণেশ পূজা।

৯ই সেপ্টেম্বর — এই দিন চুচূড়া থেকে দণ্ডীস্বামী শ্রীনিত্যবোধআশ্রম অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাতে আসেন। শ্রীশ্রীমা ও তাঁর উপস্থিতিতে আশ্রমে উপস্থিত ভক্তগণ সৎসঙ্গে কিছু সময় ব্যতীত করেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর — ১৮ই আগষ্ট-এ নির্ধারিত প্রবচনের দিনে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রবচনের দিন পরিবর্তিত করে এই দিন নির্ধারিত হয়েছিল। এইদিন সকালে সৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ক্রিয়াযোগের উপর প্রবচন দেন। শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক প্রবচনের দ্বারা উপস্থিত সকলে ক্রিয়াযোগের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন।

২২শে সেপ্টেম্বর — এইদিন আধ্যাত্মিক সভার ৩২তম পর্বে 'কঠোপনিষদ্'-এর ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন গুরুভ্রাতা ডাঃ বরুণ দত্ত।

अर्धनारीश्वर
परमब्रह्म स्वरूप का एक अद्‌भुत प्रकाश
श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

'अर्धनारीश्वर' शिव और दुर्गा की एकीकृत मूर्ति है। इस मूर्ति में भगवान शिव अर्धभाग में नारी और दूसरे भाग में नर है। शिव और दुर्गा का सम्मिलित मिश्रण इस मूर्ति में दिखाई देता है त्रिनेत्र, चतुर्भुज, हस्त में पाश, रक्तकमल, नर-कपाल और शूल। लिंग-पुराण में वर्णित है कि कल्पान्तर में सृष्टि की तपस्या में निमग्न होकर प्रजापति ब्रह्मा आरंभ में कुछ भी सृष्टि नहीं कर पा रहे थे। तब स्वयं के ऊपर ही ब्रह्मा को क्रोध आया एवं उस क्रोधावेश से उनके चक्षुओं से जल निर्गत होने लगा। उन चक्षुओं के जल से हठात् जन्म हुआ विभिन्न भूत-प्रेतों का। प्रथम सृष्टि के मध्य भूत-प्रेतों के समाहार दर्शन से ब्रह्मा के मन में अत्यंत कष्ट हुआ। इस पर उन्होंने प्राणत्याग करने का संकल्प लिया। परन्तु प्राणत्याग के क्षण ही ब्रह्मा प्रजापति के मुख से प्राणमय रुद्र का आविर्भाव हुआ। उस रुद्रशिव की आविर्भूत मूर्ति ही थी 'अर्धनारीश्वर' रूप की। उस मूर्ति का विभाग करके ही उसके एकांश से उमा महेश्वरी की सृष्टि की थी रुद्रशिव ने।

सृष्टितत्त्व के आदिस्वरूप में उपनीत होने पर देखा जाता है 'ब्रह्म' या 'पुरुष' सत्ता ही ब्रह्मा या ब्रह्म अर्थात् चैतन्ययुक्त विराट् आत्मा और 'शक्ति' आद्यारूपा 'महाप्रकृति' या ब्रह्म का स्वभाव, त्रयीगुणात्मक सर्वव्यापी महातरंग युक्त परासम्वित्मयी महाशक्तिमयी अखण्डमंडलाकार महाप्रकाशरूप इच्छा। परमा प्रकृति स्वरूपा आद्या महाशक्ति परम पुरुष को सगुण और निर्गुण में प्रकटित कर ब्रह्माण्ड में सृष्टि कार्य की परिचालना करती है। वे स्वयंक्रिय निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप 'महाकाल' एवं शक्तिरूपा निर्गुणा महाशक्ति 'महाकाली' ही त्रिकाल को प्रकटित कर रहते है। सृष्टि कार्य के सम्पादन के निमित्त ब्रह्मकर्तृक विराट् मन से अति सूक्ष्मा निर्गुणा ईश्वर से अभिन्न नित्या, आद्या परमाशक्ति प्रकटित हुई। इन परमाशक्ति के साथ ब्रह्मा ने हृदय में भगवान महादेव का ध्यान कर तपस्या की एवं योगयुक्त ब्रह्मा के तीव्र तपस्या से पितृसत्ता शीघ्र ही संतुष्ट हुई। इसके पश्चात् महादेव अर्धनारीश्वर सगुणरूप में ब्रह्मा के निकट प्रकटित हुए। यह 'अर्धनारीश्वर' स्वरूप ही 'शिव और शक्ति' सत्ता के साधन-मार्ग का मोक्ष या चरम अवस्था की परिणति है। 'शिव और शक्ति' सत्ता की अद्वैत स्थिति हुई 'स्वभावसिद्ध योग' तपप्रथा। प्रकृतपक्ष में शक्ति और शक्तिमान तत्त्व के मध्य अभिन्नता और समता एवं एक की दूसरे के ऊपर सम्पूरकता प्रकट करने के लिए ही श्रीभगवान ने चेतन बोधि की भूमि पर अपने अर्धनारीश्वर रूप को व्यक्त किया था।

पुराण में एक कथा है – एक समय देवी पार्वती ने शिव के हृदय में अपने देह की छाया देखकर सोचा कि अन्य कोई रमणी उनके स्वामी के हृदय में विराज कर रही है। यह देखकर तो गौरी अत्यंत कुपित हो उठी तब शिव ने उन्हें प्रकृत सत्य को विभिन्न प्रकार से समझाया। अन्त में देवी की भ्रान्ति दूर हुई एवं देवी का हृदय लज्जा बोध से पीड़ित हुआ। स्वाभिमानवश देवी ने शिव से कहा, ''मेरी छाया जैसे निरन्तर तुम्हारे शरीर में अवस्थान करती है, मैं चाहती हूँ कि मेरा वास्तविक सत्तायुक्त शरीर भी तुम्हारे शरीर के मध्य अवस्थान करे। मेरे प्रकृत शरीर के सर्वांश का आप प्रगाढ़ आलिंगन द्वारा स्पर्श करें; जिस विधि से यह संभव हो वह आप करे।'' तब शिव ने कहा, ''तथास्तु। देवी तुम मेरे अर्ध-शरीर को ग्रहण करो अथवा अपना अर्ध-शरीर मुझे दो। मेरे अर्ध-देह में हो नारी और अर्ध में हो पुरुष। तुम यदि अपने शरीर को दो अर्धभागों विभाजित कर सको तो, मैं

अपने शरीर के मध्य तुम्हारी सत्तादेह का अर्धांश हरण कर लूँगा।'' देवी पार्वती ने कहा, ''मैं दो शरीरों को एक करना चाहती हूँ। आप यदि मेरे शरीर का अर्धांश हरण करते हैं, तो मैं भी आपके शरीर का अर्धांश हरण करना चाहती हूँ।'' शिव ने तब शिवानी की बातें स्वीकार की। दोनों की अभिन्नसत्ता के शब्द और अर्थ के अनुसार परमेश्वर शिव शिवानी के नारी शरीर का अर्धांश हरण कर 'अर्धनारीश्वर' हुए।

मत्स्य-पुराण में अर्धनारीश्वर प्रतिमा की वर्णना है। प्रतिमा के अर्धांश में ईश-शिव की मूर्ति में बालचन्द्र की कला संयुक्त जटाभार और अन्य अर्ध में उमा की मूर्ति में माँग का चिह्न एवं तिलक है। इस मूर्ति के दक्षिण कर्ण में नागराज वासुकि और उमा के अर्धांश वामकर्ण में कुण्डल है। दक्षिणार्ध में शिव के हस्त में है कपाल अथवा त्रिशूल, वामार्ध में पार्वती के हस्त में है पद्मफूल। केयूर एवं वलय द्वारा विभूषित वामार्ध की वामबाहु एवं नाग यज्ञोपवीत यथास्थान में सन्निवेशित है। वामार्ध में पीन स्तनभार, इसके ही अध:भाग में सुगठित नितम्ब है। दक्षिण में शिवार्ध में व्याघ्रचर्मावृत लिंग ऊर्द्ध अवस्था में अवस्थित है। वामार्ध में रत्नसमन्वित लम्बमान कटिसूत्र, दक्षिणभाग भुजंगवेष्टित है। महादेव का दक्षिण पद पद्म के ऊपर आसीन है और बायीं ओर कुछ ऊपर में देवी पार्वती की नुपूर एवं रत्नभूषित पद अवस्थित है। समस्त अंगुलियों में मुद्रिकाएँ हैं और देवी का चरण आलता से रंजित रहता है।

–यह हुई अर्धनारीश्वर की मूर्ति।
''नील प्रवाल रुचिरं विलसत्त्रिनेत्रं
पाशरुनोत्पल-कपाल-त्रिशूल-हस्तम्।
अर्धाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्त भूषं
बालेन्दुबद्ध मुकुटं प्रणमामि रूपम्।।''
–इति शारदातिलक तंत्र

मूर्ति उपासना हिन्दुधर्मशास्त्र में सगुण विग्रह की उपासना है। 'सगुण' शब्द के मध्य शाश्वत सनातन भाव है। शास्त्रसम्मत पूजित सभी मूर्तियों के मध्य ही अन्तर्निहित योगतत्त्व समावेशित रहता है। इसीलिए मूर्ति के मध्य रहता है सृष्टितत्त्व के बोधचेतना के स्तर का प्रकटरूप। इन सत्य प्रतीक स्वरूप विग्रहादि का साधन रहस्य है गुप्त विषय। शरीर मध्यस्थ शिराएँ जैसे बाहर से देखी नहीं जा सकती, जैसे देहाभ्यन्तरस्थ शिराओं के मध्य वैद्युतिक वायुरूपी प्राण का प्रवाह भी बाहर से समझा नहीं जाता, वैसे ही तन्त्रशास्त्रों के तत्त्वादि अति निगूढ़ और उपलब्धि सापेक्ष होते हैं। तन्त्र योग में समग्र सृष्टितत्त्वों के जो ज्ञाता होते हैं वे हैं स्वयं शिव। वे शिव ही हैं समस्त तंत्रशास्त्र के प्रणेता। तन्त्र में आगम-निगम योगशास्त्र हर और पार्वती को लेकर ही गठित है। मूर्ति है बोधचेतना का एक-एक प्रतीक स्वरूप। उसी प्रतीकरूपी प्रतिबिम्ब को अवलम्बन कर साधकयोगी योगयुक्त अवस्था में बिम्ब में पहुँचते हैं। उपर्युक्त भगवान शिव और पार्वती के लीलायन के माध्यम से जो अर्धनारीश्वर मूर्ति का आविर्भाव हुआ, वह योगमार्ग की एक विशेष अवस्था को प्रकाशित करती है। शिवसत्ता और शक्तिसत्ता का योगयुक्त साधन इस अर्धनारीश्वर स्तर से ही आरम्भ होता है। सहस्रार के ऊपरिभाग में व्योममण्डल में मणिपुर पद्म के सदृश एक दशदल कमल का आविर्भाव होता है। यह कमल कोटि सूर्य और चन्द्र की ज्योति द्वारा आप्लुत रहता है। उस कमल की कर्णिका में नारंगी के फाँक के सदृश ओतप्रोत भाव से दो आमने-सामने युक्तावस्था में आसीन अवयव देखे जा सकते हैं। वही हुआ 'अर्धनारीश्वर' बोधचेतना का प्रकाशमय दर्शन। यह योगमार्ग की अष्टम भूमि कहकर चिह्नित होती है। इसी भूमि से शिवसत्ता और शक्तिसत्ता की समरस्यता या साम्यता प्राप्त होती है। योग के पथ में द्वैत सत्ता यहीं अद्वैत स्थिति को प्राप्त होती है। ठीक जैसे एक साबुत चनक के भीतर दो भाग। इस अवस्था में परिपक्व होते-होते अवशेष में संयुक्त अवस्था के स्तर पर उपनीत होकर शिव और शक्तिसत्ताद्वय शाश्वत परम पुरुष और परमा प्रकृति रूपी शुद्ध सत्त्वोर्जित सत्ता में अद्वैत स्थिति में नित्य अवस्था में आसीन होते हैं।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

बिज्ञप्ति

पुस्तकालय के वार्षिक संरक्षण हेतु सदस्यता शुल्क (१००/- रुपये) ३१ जनवरी २०२० तक भुक्तान कर दिया जाये।

पुण्यसलिला कावेरी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

एकबार प्रलयकाल में बालकरूपी श्रीहरि ने मार्कण्डेय ऋषि को अपने देहाभ्यंतर में आश्रय दिया था। प्रलयकाल में धरित्री के जल निमग्न होने के पश्चात् इसी प्रकार श्रीहरि ने मार्कण्डेय ऋषि की प्राणरक्षा की थी। श्रीहरि की देह में आश्रय प्राप्त कर मार्कण्डेय ने देह में भ्रमण करते-करते उनके उदर के भीतर अनेक नदियों को देखा। उन सब के मध्य 'कावेरी' एक नदी थी।

पुराण में कावेरी नदी को नारीरूप में चिह्नित किया गया है। कावेरी युवनाश्व की कन्या थी एवं पिता के अभिशाप से वे नदीरूप को प्राप्त हुई। पुराण प्रसिद्ध जह्नुमुनि ने युवनाश्व राजा की नदीरूपा कन्या कावेरी से विवाह किया था। कावेरी और जह्नु को एक पुत्र था। उनका नाम सुहोत्र था। नदी मातृका कावेरी का और एक नाम दक्षिण की गंगा था। दक्षिण भारत की अन्यतम प्रधान और पवित्र नदी है कावेरी। महाभारत के सभापर्व में है कि स्वर्लोक में वरुणदेव की सभा में जो समस्त नदीमातृकागण उपयुक्त देहधारण कर उनकी उपासना करती है उनमें कावेरी अन्यतमा है। यह नदी सर्वदा अप्सराओं द्वारा वेष्टित रहती है। कावेरी में स्नान करने पर सहस्र गो-दान का फल प्राप्त होता है तथा स्वर्गलोक में वास करने का अधिकार भी मिलता है। कावेरी और नर्मदा नदी का संगमस्थल कावेरी-संगम कहकर परिचित है। यह एक अति पवित्र तीर्थ है। इस स्थल पर कुबेर ने हज़ार वर्ष पर्यन्त महादेव की तपस्या कर यक्षाधिपति पद लाभ किया था। इस तीर्थ के दर्शन से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है एवं इसका जल स्पर्श करने मात्र से ही स्वर्गलाभ होता है।

कावेरी नदी का उत्पत्तिस्थल सह्याद्रि पर्वत है। पुराण में कथित है कि लोमश ऋषि ने तप के प्रभाव से कावेरी नदी को स्वर्ग से मर्त्य में आनयन किया। तीर्थ भ्रमण के समय स्वयं बलराम ने इस पवित्र नदी-तीर्थ की परिक्रमा की थी।

कावेरी नदी पवित्र अग्नि का उत्पत्तिस्थल है। हव्यवहनकारी अग्नि सोलह नदियों की कामना करती है उनमें कावेरी अन्यतमा है।

(सहायक ग्रंथ : वायुपुराण, हरिवंश, महाभारत, भागवत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (६८) : एकबार मैं (श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा) अपने छोटी भगिनी के पति को श्रीश्रीबाबा

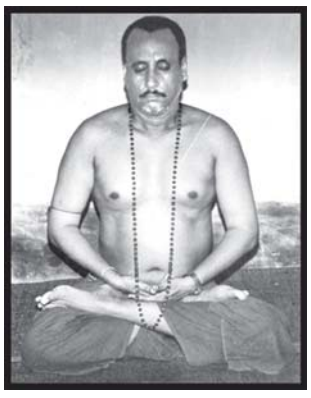

(श्रीश्रीसरोज बाबा) के पास लेकर गया। मेरी भगिनी के पति क्रिकेट के अत्यंत शौकीन व्यक्ति थे। क्रिकेट की चर्चा के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में उनकी कोई रुचि नहीं थी। संध्या का समय था जब मैं उन्हें श्रीश्रीबाबा के पास लेकर गया था, गुरुमहाराज अपने शिष्यों के साथ किसी एक विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। मैंने देखा, भगिनी-पति को उन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी और ना ही जानने का आग्रह। हठात् श्रीश्रीबाबा ने क्रिकेट के संबंध में चर्चा प्रारम्भ कर दी, इस प्रकार बातें कर रहे थे मानों बाबा क्रिकेट के सब मैचों का सूक्ष्म से सूक्ष्म अवलोकन करते हैं एवं बाबा को बल्ला और गेंद की भी अत्यधिक अभिज्ञता है। तब देखा भगिनी-पति अत्यंत उत्साहित हो रहे है। कुछ समय तक चर्चा चलने के पश्चात् बाबा ने अन्य किसी बात पर चर्चा नहीं की। उसके बाद हमलोग वहाँ से निकल गये। जाते-जाते भगिनी-पति ने कहा, ''तुम्हारे गुरुदेव दूरदर्शन पर बहुत मैच देखते हैं।'' मैंने कहा, ''बाबा के पास समय कहाँ हैं, बाबा तो सब समय भावस्थ रहते हैं।'' मैंने अपने गुरुमहाराज का जो महाभाव देखा है, ठीक वैसे ही हमारे अखण्ड

महापीठ आश्रम में श्रीश्रीमाँ के मध्य महाभाव देखता हूँ।

प्रसंग (६९) : मैं (श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा) एकबार अपने एक डॉक्टर बन्धु को श्रीश्रीबाबा (श्रीश्रीसरोज बाबा) के पास ले गया। वे थे शिशु-रोग विशेषज्ञ। श्रीश्रीबाबा के साथ उनका परिचय करवाने पर बाबा ने कहा, ''हमलोगों के देश में अभी भी अच्छे शिशु-रोग विशेषज्ञों का अभाव है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य अनेक बातें की। डॉक्टर मित्र इतने अभिभूत हो गये थे कि कुछ रुपये भेंट स्वरूप बाबा को देने लगे, इसपर श्रीश्रीबाबा ने जिज्ञासा किया, ''यह क्या है?'' बन्धु ने कहा, ''बाबा यह सामान्य सी दक्षिणा है।'' बाबा ने गुस्से से कहा, ''जो देने आये हो उसे अभी अपनी जेब (Pocket) में रखो।'' मित्र ने भयभीत होते हुए कहा, ''बाबा, थोड़ी कृपा नहीं करेंगे?'' बाबा ने कहा, ''मैंने तुम्हें जो करने को कहा है वह करो। अभी अपने घर जाओ। बाद में फिर आना।''

अर्थ (पैसे) लेने के संबंध में मैंने लक्ष्य किया कि बाबा साधारणत: अपने हाथों में रुपये नहीं लेते थे एवं हर किसी से तो अर्थ लेते ही नहीं थे। बाद में सुना कि बाबा उस व्यक्ति का आधार देखते एवं पूर्वजन्मकृत फल देखते। अखण्ड महापीठ आश्रम की श्रीश्रीमाँ के संबंध में मैंने स्वयं देखा है एवं उनकी विभिन्न सन्तानों से भी सुना है कि श्रीश्रीमाँ के मध्य भी यही भाव प्रबलरूप से विराजित है।

प्रसंग (७०) : (श्रीश्री सरोज बाबा) के घर में तब दुर्गापूजा होती थी। हमलोगों को एक अलौकिक खुशी का अनुभव होता था। एक वर्ष की बात है दुर्गापूजा के कुछ दिन पहले एक सुबह हठात् मिहिरदा (बाबा के क्रियान्वित सन्तान) मेरे घर में आए और माँ से कहा, ''बाबा ने आपके घर में भेजा है, पूजा के लिए ३०००/- रुपये कम हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि 'जाओ, प्रदीप की माँ से लेकर आओ'।''

दुर्गापूजा जैसी इतनी बड़ी पूजा के लिए ३०००/- रुपये बाबा ने मंगवाएँ हैं इसी आनन्द में माँ ने अलमारी खोल कर देखा कि थोड़े-थोड़े करके इधर-उधर रखे हुए पूरे ३०००/- रुपये थे। माँ ने वे रुपये मिहिरदा को दे दिये। पूजा अच्छे से सम्पन्न हो गई। हठात् माँ के मन में आया कि बाबा तो इच्छा मात्र से ही ३०००/- रुपये संग्रह कर सकते थे, इसके अतिरिक्त बाबाके तो अनेक धनी शिष्य भी है। ऐसा सोचकर माँ जब भी श्रीश्रीबाबा के पास आती तभी बाबा से कहती, ''बाबा पूजा तो सम्पन्न हो गई है मेरे जैसी मध्यवर्गी स्त्री से आपके द्वारा रुपये लेना उचित नहीं हुआ है। मेरे रुपये मुझे लौटा दीजिए।''

एक दिन श्रीश्रीबाबा ने माँ से कहा, ''माँ चिन्ता मत करिए, आपके बहुत दिनों से बड़े कष्ट के साथ एकत्रित किए हुए रुपये, अति शीघ्र ही आपको मिल जाऐंगे।''

मेरे पिताजी दूरसंचार कार्यालय (Telephone Office) में नौकरी करते थे। हमारे घर में फोन का connection लेने के समय सरकार द्वारा ३०००/- रुपये Caution Money ली गई थी। हठात् ही केन्द्र सरकार (डाक एवं तार विभाग) ने घोषणा की कि - जो व्यक्ति दूरसंचार कार्यालय में नौकरी करते हैं उन्हें Caution Money लौटा दी जाएगी। निर्दिष्ट समय ३०००/- रुपये दे दिये गये और गुरुदेव के कथानुयायी मेरी माँ को भी शीघ्र ही रुपये मिल गये।

प्रसंग (७१) : मेरी माँ तब गुरुदेव के पास अक्सर आती जाती थी। एक बार रात्रि के ९ बजे माँ की हार्दिक इच्छा हुई कि वे श्रीश्री सरोज बाबा को खीर खिलायेंगी। माँ तब उसी समय खीर बनाकर रिक्सा से सरोजबाबा के घर गयी। उस समय प्राय: १०:३० बज रहे थे। माँ ने देखा बाबा के घर के एकतल्ला का दरवाजा खुला है, कोई व्यक्ति नहीं है, बाबा अकेले बैठे हुए हैं थाली में रोटी और प्याली में तरकारी है, बाबा की मँझली लड़की 'सोना' खड़ी है, माँ को देखकर बोली, ''देखिए ना, बाबा रोटी खाना नहीं चाह रहे है सिर्फ एक ही बात बोलते जा रहे हैं – 'मेरी खीर खाने की अत्यंत इच्छा हो रही हैं। मैं खीर खाऊँगा'। इतनी रात्रि में कहाँ से खीर मिलेगी बोलिए तो! माँ से कहा तो माँ ने कहा, कल बना दूँगी।'' मेरी माँ ने तब कहा कि, ''मैं खीर लेकर आयी हूँ।'' सोना ने तब श्रीश्रीबाबा से कहा, ''प्रदीपबाबु की माँ तुम्हारे लिए खीर बनाकर लायी है अब खा लो।'' बाबा ने कहा, ''ओह! अच्छा, खाऊँगा।'' उसके बाद श्रीश्रीबाबा ने माँ से कहा, ''माँ बहुत रात हो गई है, आप घर जाइए।''

...क्रमश:

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी
(बुद्ध पूर्णिमा - ई २०१९)

प्रश्न-१ 'ऋषि' किसे कहते हैं? योगी साधक कब 'ऋषि' अवस्था को प्राप्त होते हैं? 'ऋषि' अवस्था में योगी को क्या होता है?

उत्तर – आकाशमार्ग में जो विचरण करने में समर्थ होते हैं, जिनका चित्त सर्वदा ही आकाश का दर्शन करता है वे ही होते है 'ऋषि'। जब योगीसाधक 'केवली प्राणायाम' सिद्ध होते हैं तब वे 'ऋषि' अवस्था में उपनीत होते हैं।

केवली प्राणायाम सिद्ध योगी ऋषि-अवस्था प्राप्त कर सर्वदा ब्रह्ममार्ग में विचरण करते हुए ऋतज्ञान से अपने घट को पूर्ण कर ऋतम्बर हो जाते हैं। ऋषि सृष्टि रहस्य के समस्त विषय ज्ञात करने में सक्षम होते हैं। ऋषि अवस्था में आसीन योगी समाधियोग में ब्रह्मस्वरूप में परिणत हो जाते हैं।

प्रश्न-२ समाधिपाद में उपनीत होने के लिए योगी को तीन अवस्थाओं का पालन करना पड़ता है, वे तीन अवस्थाएँ कौन-कौन सी है?

उत्तर - समाधिपाद में आसीन होने के लिए तीन अवस्थाएँ हैं – मन का संयम और अन्तर्मुखीनता, निरवच्छिन्न मौनता (स्थूल और सूक्ष्म चेतना में अवस्थान करते हुए) एवं आसन में समासीन होकर निरन्तर ध्यान।

प्रश्न-३ योगी सत्य प्रतिष्ठा कब लाभ करते हैं?

उत्तर – स्थितप्रज्ञ योगी लययोग में समाधि में ही प्रकृत सत्यप्रतिष्ठा लाभ करते हैं।

प्रश्न-४ 'चिन्ता' कहाँ से उदय होती है? हमारे मन की चिन्ता की तरंग को कैसे स्तब्ध किया जा सकता हैं?

उत्तर – चिन्ता आत्मशक्ति से प्रबुद्ध होती है। हमारे मन की चिन्ता के मूल में निहित है हंसरूपी श्वास-प्रश्वास का अनुलोम-विलोम। इसीलिए सर्वप्रथम योगी को श्वास का संयम कर, श्वास को संवर्धित कर, श्वास के अनुलोम-विलोम या पूरक और रेचक में समता प्राप्त कर लेनी होगी। तत्पश्चात् श्वास के घर्षण से सूक्ष्मरूप में आलोकमय मेरुदण्ड की सृष्टि होती है एवं वहीं वैद्युतिक शक्ति का उदय होता है जिसके फलस्वरूप सत्ता में अन्तश्चेतना का जागरण होता है। प्राणायाम साधना में सुषुम्ना मार्ग में आकाशतत्त्व में मन को स्थिर कर, स्थिरश्वास का अवलम्बन कर योगी जब निश्चल ध्यान में उपनीत होता है, तब चित्तवृत्ति निरोध होकर योगी की सत्ता में चिन्ता की सब तरंगे स्तब्ध हो जाती है।

प्रश्न-५ चित्त की एकाग्रता कैसे लाभ होती है?

उत्तर – जब तक मन के संकल्प-विकल्प नष्ट नहीं हो जाते तब तक चित्त की एकाग्रता नहीं होती। सर्वदा भगवान का स्मरण मनन निदिध्यासन ही एकाग्रता लाभ का श्रेष्ठ उपाय है।

प्रश्न-६ 'अवधूत' किसे कहते हैं? पतांजलिदेव ने किससे अष्टांगयोग प्राप्त किया था?

उत्तर – जीवनमुक्त ज्ञानी को 'अवधूत' कहा जाता है। पतंजलिदेव ने दत्तात्रेय भगवान से अष्टांगयोग प्राप्त किया था।

प्रश्न-७ किस पर्वत पर हर-पार्वती के तपस्या के दौरान नर्मदा नदी का आविर्भाव हुआ?

उत्तर – हर-पार्वती द्वारा 'ऋक्ष पर्वत' पर तपस्याकाल में नर्मदा नदी का आविर्भाव हुआ।

प्रश्न-८ 'वसुमती' किसका नाम है? उसका नाम वसुमती क्यों पड़ा?

उत्तर – 'वसुमती' पृथ्वी का नाम है। सुवर्ण अग्नि के तेज से उत्पन्न हुई थी इसीलिए अग्नि का नाम हुआ 'हिरण्यरेता:'। देवी वसुधा ने इस सुवर्ण तेज को धारण किया था इसीलिए इसका नाम हुआ 'वसुमती'।

प्रश्न-९ 'बुद्धि' किसे कहते हैं?

उत्तर – अन्त:करण की जिस शक्तिबल से किसी भी विषय को संशयहीन भाव से उपलब्धि किया जाता है, वही 'बुद्धि' नाम से परिचित होती है।

प्रश्न-१० भगवान कपिल के पिता और माता का नाम क्या है? किस नदी के तट पर कपिल के पिता ने तपस्या की थी? कपिल की स्त्री का नाम क्या था?

उत्तर – भगवान कपिल के पिता थे ब्रह्मा पुत्र कर्दम प्रजापति एवं माता थी स्वायम्भूव मनु की कन्या देवहुति। सरस्वती नदी के तट पर कपिल के पिता ने तपस्या की थी। 'धृति' नाम की ऋषि कन्या के साथ कपिल का विवाह हुआ।

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(२४)

श्रुतिस्मृतिमविज्ञाय-केवलं गुरुसेवया।
ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ता इतरे
वेशधारिणः।। ७५

श्रुतिस्मृतिम् अविज्ञाय केवलं गुरुसेवया (ये जनाः गुरुं जानन्ति) ते वै सन्न्यासिनः प्रोक्ताः, इतरे (जनाः) वेशधारिणः (सन्न्यास-वेशधारिणः एव न तु सन्न्यासिनः इति विजानीयात्) ७५

जब यह स्थिर हुआ कि गुरु को प्रत्यक्षभाव में जानना पड़ेगा तब श्रुति व स्मृतिवाक्य पाठ द्वारा परोक्षभाव में जानना निष्प्रोजन है, ऐसा बोध हो रहा है (स्मृति अर्थात् यद्द्वारा गुरु का स्मरण किया जाता है एवं वेद अर्थात् यद्द्वारा गुरु को जाना जाता है); अतएव कहा गया है कि, केवलमात्र गुरुसेवा करते जाओ, अर्थात् ऊर्ध्वस्थित गुरुपद पर लक्ष्य रखकर कार्य करते जाओ, ऐसा होने से तुम प्रकृत सन्न्यासी कहकर परिचित होओगे (अर्थात् अंधकार छोड़कर आलोक के आश्रय में जो है, वह ही सन्न्यासी है); एवं अन्य समस्त जो सब आलोक आश्रय में नहीं हैं एवं वाह्य रूप को आलोक मानते हुए अंधकार को ही आलोक कहकर समझते है अथच वाह्यभाव में सन्न्यासी वेश धारण कर सन्न्यासी कहकर अपना परिचय देते हैं, वे सब मिथ्या-वेशधारी कपट सन्न्यासी मात्र है। ७५

गुरुकृपा प्रसादेन आत्मारामो हि लभ्यते।
अनेन गुरुमार्गेण आत्मज्ञानं प्रवर्त्तते।। ७६

गुरुकृपा प्रसादेन (नरेण) आत्मारामः हि (निश्चितं) लभ्यते, अनेन गुरुमार्गेण आत्मज्ञातं प्रवर्त्तते।। ७६

गुरुसेवा द्वारा गुरुकृपा होती है एवं कृपा होने से गुरु प्रसन्नभाव धारण करते हैं; गुरुप्रसन्न होने से जीव आत्मानंद लाभ करता है (अर्थात् जीव परसंग से कष्ट पा रहा था, अब गुरुमार्ग अवलम्बन करते हुए आत्मसंग में आनन्द पा रहा है – ''आत्मारामः फलाशी गुरुचरणरतः''), एवं इस गुरुमार्ग पर गतिमान होकर जीव को आत्मज्ञान लाभ हो रहा है अर्थात् गुरु ही आत्मस्वरूप एवं देह या जगत् पराए है, यह ज्ञान होता रहता है।। ७६

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकम्।
स्थावरं जंगमंचैव प्रणमामि जगद्गुरुम्।। ७७

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं (परिव्याप्तं) परमात्मस्वरूपकं (यत्ब्रह्म) स्थावरं जंगमं च एव (दृश्यते), जगन्मयं (तत्गुरुं) प्रणमामि।। ७७

इस देहरूपी संसारवृक्ष का शीर्षस्थान या मूल है ऊर्द्ध में (गीता १५ अः, १ श्लोक देखो); अधस्तम स्थान या वृक्ष तने के अग्रभाग हैं निम्नस्थित मूलाधार (मूल का आधार हैं इसीलिए इसे मूलाधार कहते है) अर्थात् यही परमात्मा का प्रकाशमान रूप अर्थात् स्थावर जंगमात्मक यह प्रकाशमान जगत् ही परमात्मा का रूपस्वरूप हैं। इस मतानुसार जगत्व्यापी परमात्मस्वरूप गुरु को नमस्कार करता हूँ।। ७७

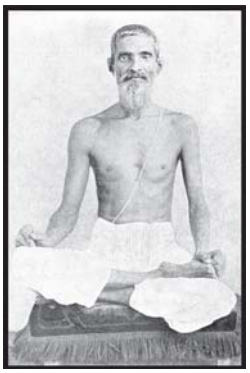

यह वृक्ष है ब्रह्म की कल्पनाप्रसूत जीव देह, जीव ऊर्द्ध से अधः एवं अधः से ऊर्द्ध, इस प्रकार द्विविध गति के द्वारा कर्म करता है, अतएव ब्रह्म सम्भूत कर्म ही जीव के जीवनरक्षा का उपाय स्वरूप है (गीता ३ अः, १५ श्लोक देखो)। अर्थात् जब तक कर्म है तब तक देह है, कर्मों के शेष होने पर किसी का ब्रह्म में लय हो जाता है, एवं किसी का देह में लय होता है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन कर्मों के दो नियामक हैं, एक ब्रह्म जो ऊर्द्ध में है एवं अन्य मोह जो देह मध्य अवस्थान करता है। एक कर्म के द्वारा कर्म शेष होकर ब्रह्म में लय हो जाता है, एवं अन्य कर्म द्वारा कर्म शेष ना होकर क्रमशः एक के ऊपर अनेक कर्मों का संचार होता रहता है। परन्तु देह तो चिरकाल तक नहीं रहेगी, कर्मों के साथ-साथ देह का भी अवसान हो जाता है, एवं जीव की भी कर्मवश देह से पुनराय देह-कल्पना में जन्म-जन्मांतर में गति होती है। इस प्रकार जन्म-जन्मान्तर गति के द्वारा परिशेष में जीव जिस सूत्रावलम्बन से कर्म करने में सक्षम हुआ था,

उस सूत्र से विच्छिन्न हो जाता है, तब मोह उसे अपने पाश में जकड़ लेता है – जीव तमसावृत पाताल में जाकर जड़वत् होकर पड़ा रहता है। इस दुर्गति से बचने के लिए ही है ब्रह्मक्रिया का साधन, जीव जिससे ब्रह्म सूत्रावलम्बन के द्वारा ऊर्द्ध में गति प्राप्त कर ब्रह्म में लय प्राप्त कर कर्म शेष करने में सक्षम होता है, यही है जीवनयात्रा को सुचारुरूप से शेष करने का उपाय एवं यहीं है जीवधर्म का कर्त्तव्य, अन्यथा मोह-पाश द्वारा परधर्मानुशीलन से अकृतज्ञ जीव के अधर्म का परिचय मिलता है। जहाँ से उत्पत्ति वहीं निवृत्ति यही धर्मपन्थ है, एवं भिन्नपन्थावलम्बन से भिन्न विषय में परिणति, यही है अधर्मपन्थ।

...क्रमशः

(*कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त*)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

उन्मेष

(२८)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–

(*गतांक से आगे...*)

श्रीश्रीमाँ – तुमलोग गौर करो तो देख पाओगे कि प्रत्येक ऋतु में पूर्णिमा के चाँद का भिन्न रूप होता है अर्थात् उसके प्रकाश का रूप बदल जाता है; अर्थात् प्रत्येक पूर्णिमा में चाँद का आलोक एक समान नहीं होता। कोई रूपहला, कोई सुनहला, कोई चम्पक वर्णी हल्का पीला होता है, चन्द्र में ज्योति का प्रकाश विभिन्न प्रकार का होता है या नहीं? इस आकाश के भी वैसे ही अनेक रूप है। किसी ने विश्वप्रकृति को भलीप्रकार से देखा ही नहीं है। अपने अन्दर की प्रकृति को देखना तो बहुत दूर की बात है। देखो, तुमलोग कहीं घूमने जाते हो, तब तुम्हारे मन में आनन्द होता है या तुम्हें अच्छा लगता है, क्यों? नदी का किनारा अच्छा लगता है, समुद्र की तरंगे अच्छी लगती है, पहाड़ अच्छे लगते हैं – क्यों अच्छे लगते हैं? क्या कभी यह सोचा है? इस विश्वप्रकृति का रूप इतना सुन्दर, इतना पवित्रतापूर्ण क्यों है? – उसके भीतर जो दिव्य का प्रकाश है, सृष्टिकर्त्ता भगवान के चिन्तन का प्रकाश है, भगवान के मधुर भाव का प्रकाश है, उसी कारण तुम्हारे मन एवं आत्मा के साथ उनका जो बोध युक्त है, उस परम पवित्रमय का स्पर्श जो तुम्हारे अन्तर के पवित्र दर्शनानन्द को चैतन्य प्रदान करता है, उसी के अव्यक्त प्रभाव हेतु ही तुमलोगों को विश्वप्रकृति के सौन्दर्य को देखना अच्छा लगता है। यह विषय कभी भी साधारण मनुष्य की चेतना में ग्राह्य नहीं होता – तुमलोग कभी भी इस विषय पर नहीं सोचते। साधारण मनुष्यों की यह बुद्धिशक्ति नहीं होती कि इस विषय पर सोच सके। जिनके अन्दर वह भावना रहती है कि किसने इस सुन्दर विश्वप्रकृति की सृष्टि की है? तब उसे देखने के लिए उसका मन व्याकुल हो उठता है। यही है अन्तर के बोधोदय में ज्ञानोन्मेष। मनुष्य की सत्ता के व्यक्तित्व के मध्य जो स्वभाव है वह तो प्रकृति के समस्त खेलों के मध्य स्वतन्त्र है।

इस विश्वप्रकृति के जो गुण हैं उन गुणों से ही मनुष्यों के मध्य निजस्व स्वभाव के अनुरूप सत्त्व-रजो-तमो गुणों के वैषम्य के आकार से अन्तर में प्रकाशित रहता है। प्रकृति के मध्य सुन्दरता एवं रौद्रता दोनों ही है। जैसे, तुम पहाड़ देखने जाते हो, प्रकृति का सौन्दर्य देखने में शायद खूब ही अच्छा लग रहा है; उसी पहाड़ के जंगल में प्रवेश करो, देखोगे हठात् एक साँप निकलकर आ गया – गोखरो। वैसे ही अपने स्वभाव के मध्य भी देखो, जैसे ही मन में द्वेष जगेगा, स्वार्थसिद्धि के लिए, तभी वह साँप की तरह फन उठायेगा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ही तो पशु का स्वभाव है, है या नहीं? – अपने अन्तर के पाशविक भाव को बुद्धि शक्ति द्वारा उपलब्धि करना ही है मानव चेतना का बोधोदय। जबतक मनुष्य के मध्य इस उपलब्धि की शक्ति जागृत नहीं होती तबतक वे पशुवत् होते हैं वे जीव ही रहते हैं 'मनुष्य' नहीं होते। जब विवेक जाग्रत होता है, बोधि की शक्ति प्राप्त होती है, तब वह मानवत्व अर्जन कर साधक में परिणत होता है एवं मानव चेतना के विवर्तन में रूपान्तरित होकर 'ऋषि' होता है। देवता से ऋषि - ऋषि से महामानव होता है और उसके बाद वह शिव होता है।

...क्रमशः

(*श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

पंचकेदार के पथ पर

(३)

द्वितीय केदार तुंगनाथ की यात्रा के क्रम में सर्वप्रथम मदमहेश्वर से वापसी का पथ पड़ता है। गौभार में थोड़ा विश्राम कर वहाँ से राँशु होते हुए लेंक आया, जहाँ पर एक दिन ठहरना पड़ा। दूसरे दिन प्रातः ही लेंक से मनसुना ग्राम की यात्रा आरम्भ हुई। ५ कि.मी लंबा रास्ता है। वहाँ से बस द्वारा ऊखीमठ आया। इस रास्ते में बस दिन में केवल दोबार ही आवागमन करती है। मेरा सौभाग्य था मनसुना ग्राम के अंत में पक्की सड़क पर पहुँचने ही वाला था कि बस आती दिखी। मनसुना से ऊखीमठ की दूरी ४ कि.मी. है। बस नहीं मिलने पर एक दूसरा विकल्प था, पथगामी किसी सरकारी वाहन से सहायता माँगना। परन्तु ऐसे वाहन का मिलना निश्चित नहीं था। ऊखीमठ प्राचीन राजधानी, राजकन्या ऊपदेवी के नाम पर ही इसका नाम है। मदमहेश्वर का शीत-कालीन आवास है ऊखीमठ। चतुर्दिक पर्वतों से घिरे ऊखीमठ की प्राकृतिक सुषमा अवर्णनीय है। यहाँ पर बैंक डाक-घर, बाजार, दूकानें, विद्यालय, होटल आदि समस्त सुविधाएँ हैं। रात्रि होने पर भी कोई असुविधा नहीं है। ऊखीमठ से गोपेश्वर का बस पकड़कर चोप्ता उतरा। इसकी ऊँचाई १०,००० फीट है। चोप्ता तुंगनाथ का प्रवेश द्वार है। ऊखी मठ से चोप्ता लगभग ४० कि.मी. है। यह रास्ता सीधा चामोली को जाता है। केदार एवं बदरी को मिलाने वाला रास्ता है यह। चोप्ता से तुंगनाथ की दूरी ४ कि.मी. है। शाम के ४ बजे थे। मेरी इच्छा थी कि रात्रि विश्राम तुंगनाथ में ही करूँ। इसीलिए बस-पड़ाव पर थोड़ा जलपान कर यात्रा पर चल पड़ा। शुरु में वनों से भरा रास्ता, तत्पश्चात् मिला हरियाली विहीन पर्वत, पर्वत से सटा हुआ रास्ता जिसके बाँयी तरफ थी खाईं। अचानक सूर्य देव ने अपना मुँह छुपा लिया। पहाड़ी रास्ते पर अँधेरा छाने लगा। हेड-लैंप जला लिया। रात के अंधकार में मानों हिमालय जग पड़ा हो। गभीर नीरवता की भी एक भाषा होती है, यह मैं पहले नहीं समझता था। ऐसा लगता था मानों हिमालय और समीप आता जा रहा है। फुसफुसाहट की आवाज़ में मानों प्रकृति भी कुछ बोलना चाहती हो। निःश्वास की आवाज़ से लगता था वन-देवी का ध्यानभंग हो रहा हो। गुरुमाँ का नाम लेकर चलना शुरु किया। अचानक दूर से 'हो...ओ' शब्द सुना तथा साथ-साथ में टॉर्च का प्रकाश भी दिखा। प्रकाश बहुत द्रूतवेग से मेरी तरफ बढ़ रहा था। समीप आने पर देखा लागपत्। उसने कहा कि तुंगनाथ के पुजारीजी ने मेरे हेडलैंप के प्रकाश को देखकर उसे मेरे पास भेजा है। लागपत् के साथ पैदल चलकर आ पहुँचा मंदिर प्रांगण में, पुजारीजी ने हँसते हुए स्वागत किया। यात्री विश्रामालय में ठहरने का जगह मिला। कुछ समय बाद मैं तुंगनाथ दर्शन हेतु निकला। पुजारीजी ने बताया रात्रि में मंदिर प्रांगण में ठहरना संभव नहीं है। तुंगनाथ नाराज़ होते हैं। लागपत् ने एक कहानी सुनायी। एकबार कोई एक यात्री तुंगनाथ में आया। वे ठीक से चल नहीं पाते थे। भारवाहकों ने उन्हें यात्री-निवास में पहुँचा दिया। सभी लोगों के मना करने पर भी वे रात के अंधेरे में किसी तरह मंदिर के प्रांगण में उपस्थित हुए, उन्होंने कहा – 'यह जीवन अब किस काम का है यदि मरना ही है तो तुंगनाथ में ही मरना अच्छा है।' बहुत समझाने के बावजूद वे सभी लोगों को लौटाकर स्वयं अकेले उस मंदिर प्रांगण में ठहर गये। रात के अंधेरे में तुंगनाथ के समीप की जा रही उसकी करुण प्रार्थना सुनाई दे रही थी। अचानक वहाँ पर हाथ में त्रिशूल लिए एक जटाधारी सन्यासी आविर्भूत हुए। उन्होंने उस यात्री पर जोर से पदाघात किया और उसी वक्त वहाँ से चले जाने को कहा। सन्यासी के रुद्ररूप को देखकर चिल्लाते हुए वे यात्री-निवास की तरफ भागे। उसकी चीख सुनकर पुजारीजी, लागपत् एवं अन्य कई व्याक्ति बाहर निकल आये। उस यात्री के मुख से ही सबों ने उसकी आपबीती सुनी। सभी लोग एकसाथ मंदिर में गए परन्तु वहाँ पर कोई भी सन्यासी नहीं दिखा। पुजारीजी को अचानक यह विचार

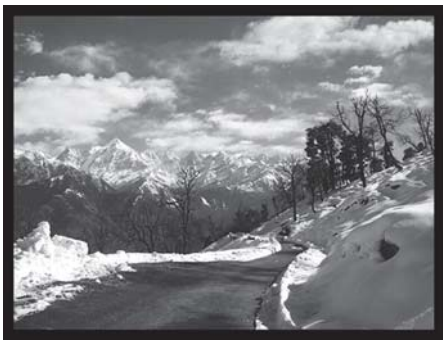

चोप्ता

आया तथा उन्होंने उस यात्री से पूछा – ''आप तो अच्छी तरह से चल भी नहीं सकते। फिर आप मंदिर से दौड़ते हुए यात्री-निवास गये कैसे?'' पुजारीजी की बातें सुनकर सबों ने कहा, ''ठीक ही तो बोल रहे हैं आप!'' अपनी अवस्था स्वयं देखकर वह यात्री विह्वल हो गया। उन्होंने बताया कि सन्यासी के पदाघात से उसका पंगुत्व समाप्त हो गया। वे बिना किसी की सहायता के चल सकते थे और दौड़ सके थे। उसके नेत्रों से वारिधारा प्रवाहमान हो रही थी। वह बार-बार कहता - यह तुंगनाथ की ही कृपा है। सन्यासी के वेष में वही आकर उसे स्वस्थ कर चले गये।

यात्री-निवास में लौट आया। आकाश में लगभग पूर्ण चंद्र देदीप्यमान था। उस प्रकाश से तुंगनाथ मंदिर का प्रांगण प्रकाशमान हो रहा था। रात्रि के ११ बजे थे। धीमी गति से चलते हुए आ पहुँचा मंदिर के प्रांगण में न तो तुंगनाथ को और न ही उस सन्न्यासी के दर्शन हेतु। रात्रिकाल में तुंगनाथ का दृश्य कैसा होता है सिर्फ यही देखने हेतु आया हूँ।

तुंगनाथ

आश्चर्यचकित होकर देखा मंदिर के प्रांगण में दोनों तरफ दो व्यक्ति उपविष्ट हैं। दोनों व्यक्तियों के हाथ में स्फटिक की माला चमक रही थी। मैं भी दरवाजे के ठीक सामने जा बैठा। ऐसा लगा कि वे दोनों व्यक्ति मेरी उपस्थिति से अप्रसन्न हो गये। अचानक वे दोनों बोल उठे, ''क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ से चले जाओ।'' ऐसा कहते हुए उन दोनों ने अपनी स्फटिक-माला को मेरी तरफ फेंक दिया। मैं कहने लगा, ''मुझे किसी वस्तु का लोभ नहीं है। आपलोग अपनी-अपनी माला ले जाइए।'' मेरे साथ मेरी गुरुमाँ हैं। भय कैसा! एक साधक दूसरे को इंगित करते हुए कहा, ''आज उस लड़के की वजह से तुम बच गये। आज यदि वह लड़का हम दोनों के बीच नहीं आता तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखलाता।'' मैं हँसने लगा। प्रकृति की शक्ति के समक्ष स्वयं की ताकत प्रदर्शित करने की बात सुनकर, हँसे बिना रहा नहीं गया। मेरी तरफ कुछ देर तक क्रुद्ध दृष्टि से देखने के बाद उन में से एक अपनी माला उठाकर मंदिर प्रांगण से बाहर चला गया। दूसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, केवल अपलक शांत नेत्रों से तुंगनाथ की तरफ देख रहा था। तत्पश्चात् धीरे-धीरे वे भी मंदिर छोड़ कर चले गये। अचानक किसी के स्पर्श से भयभीत हो गया देखा तो पुजारीजी थे। उन्होंने कहा, ''आप भाग्यवान हैं। आप अपनी गुरुकृपा से इस संकट से बच गये। घर को चलिए'' परन्तु कैसी विपत्ति, कैसी रक्षा इस विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी, यात्री निवास में लौट आया मैं। दूसरे दिन प्रातः ही नींद खुल गयी। ऊषा का आलोक तथा प्रकृति का शृंगार अतुलनीय था। लागपत् को साथ लेकर चंद्रशिला की तरफ बढ़ चला। ऊँचाई थी १४,००० फीट। वहाँ से तुंगनाथ की दूरी थी १ कि.मी.। पूरा पथ तुषारावृत कई आकृतियों में हिम; कहीं कठोर, कहीं शीशे की तरह धारदार तथा कहीं अति नरम। बर्फ का धवल गलीचा पार कर आकर पहुँचा एक अंडाकार खाने की मेज़ की आकृति वाले समतल प्रांगण में। लागपत् झुककर कुछ घास ले आया। उस घास के मूल से अति मधुर सुगंध निकल रही थी। प्रतिवर्ष Biological Survey of India के विद्यार्थी चंद्रशिला के आसपास की हिमालय के पौधों की गवेषणा हेतु यहाँ आते हैं।

तुंगनाथ में महादेव के बाहु प्रसारित हैं। गर्भगृह में लिंगमूर्ति। लिंगमूर्ति के पीछे शंकराचार्य का तैलचित्र है। बाँयी तरफ कालभैरव, दाँयी तरफ ऋषि वेदव्यास। सामने पंचकेदार की शिलामूर्ति। मंदिर पाषाणों से निर्मित है, शिखर ताँबे के पात्र पर सोने के प्रलेप से बना है। मंदिर के सामने पत्थर से निर्मित आंगन। एक तरफ पाँचमूर्तियाँ – ईश्वरी माता, विष्णु भगवान, गौरी-शंकर और भैरवनाथ। दूसरी तरफ पुजारी का आवास तथा तुंगनाथ का भंडारगृह। *...क्रमशः*

–मातृचरणाश्रित श्री सौरभ बसु

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्रीअमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (९) शिष्य के प्रति तत्त्वोपदेश–

गतांक से आगे...

जीव के कर्तृत्व के संबंध में मैं यहाँ कुछ कहूँगा। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं, तब क्या जीवों का कोई कर्तृत्व नहीं है? तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ सकता है। उसका उत्तर दे रहा हूँ – जीव-कार्य की प्रेरणा परमात्मा से आती है। किन्तु जीव-कार्य जीव के प्रयत्न के सापेक्ष है। इसीलिए जीव के कर्तृत्व को स्वीकार करना होगा। वेदान्त दर्शन में इस विषय पर एक सूत्र है - 'परात्तुतच्छ्रु तत्तेः प्रयत्न सापेक्षस्तु कर्त्ता शास्त्रार्थवत्तात्' इत्यादि। जीव को कर्त्ता नहीं कहने पर शास्त्र की कोई अर्थवत्ता नहीं रहेगी। श्रुति ने उसकी परिचालना हेतु प्रवृत्ति-निवृत्ति मार्ग का उपदेश दिया है एवं मोक्ष मार्ग को दर्शाया है। जीव यदि इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते तो वे समस्त उपदेश निष्फल हो जाते। जीव हेतु यदि यह करना संभव नहीं होता तो श्रुति फिर क्यों ये समस्त उपदेश देती। पशु, पक्षी, कीट, पतंगों हेतु ये समस्त उपदेश नहीं दिए गये। मनुष्य एवं मनुष्यों से भी श्रेष्ठतर जीवों हेतु ही श्रुति द्वारा उपदेश प्रदत्त हुआ है। जीव का कर्म स्वतंत्र है। ईश्वर के निजकृत कर्मफल का कोई भोग नहीं है। जीव निजकृत कर्मफलों को इहलोक तथा परलोक में भोगता है। उसके पापकर्मों के लिए दुःखभोग एवं पुण्यकर्मों हेतु सुखभोग निर्दिष्ट है। उनसब कर्मों के फल का नियंता ईश्वर है। वेदान्त-दर्शन में उक्ति है – 'फलमत उपपत्तेः।'

अब जीव का 'अहंकार' किसे कहते हैं इस विषय पर कुछ प्रकाश डालता हूँ। जीव का पंचभौतिक स्थूल देह है एवं मन, बुद्धि, इन्द्रियादि समन्वित सूक्ष्म शरीर है। यह सब ही त्रिगुणात्मक जड़। जीव के चैतन्यरूप देह से युक्त होने के कारण उसे चेतन कहा जाता है। अनादि अविद्या या अज्ञानवश बुद्धि इन्द्रियादि के साथ संबंध हो गया है। उसी संबंध के कारण उसके स्थूल-सूक्ष्म देह में 'मैं', 'मेरा' इत्यादि अभिमान परिलक्षित होता है। इस अभिमान को ही अहंकार कहते है। जीव का अविद्या या अज्ञान ही इसके हेतु (कारण) हैं। साधन द्वारा ये अविद्या या अज्ञान तिरोहित हो सकते है। ज्ञान और अज्ञान परस्पर विरोधी है। इसीलिए ज्ञान के बिना अज्ञान का नाश अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। जीव अज्ञानवश अपने उस स्थूल-सूक्ष्म देहातीत चैतन्य स्वरूप को नहीं जानता। जीव के निजस्वरूप को स्वयं जानने को ही ज्ञान कहते है और इसे नहीं जानने को ही अज्ञान कहते है। उसका वह अविद्या या अज्ञान अनादि होने पर भी ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है। इसीलिए श्रुति कहती है –'नान्यः पंथा विद्यते अयनाय।' अयन शब्द का अर्थ है गमन अर्थात् ब्रह्मप्राप्ति। ज्ञानोदय के बिना जन्म-मृत्युरूपी बंधन छिन्न नहीं हो सकता।

ज्ञानोदय के पश्चात् वह अहंकार विशुद्धभाव धारण करता है। जीव तब कहता है, 'मैं ही ब्रह्म हूँ।' तब उसका अहंकार स्थूल, सूक्ष्म देह में स्थित न होकर ब्रह्म में अवस्थान करता है। इसीलिए ब्रह्म को ही जीव का स्वरूप कहा गया है। ज्ञानोदय होने पर जीव का संचित कर्म नष्ट हो जाता है। किन्तु प्रारब्ध कर्मफल भोग किए बिना समाप्त नहीं होता। पूर्वजन्म में मृत्यु के पूर्व उस जन्म के या उसके भी पहले के जन्मों के जो सब पाप एवं पुण्य कर्म फलोन्मुख होते है, वे समस्त एक साथ मिलकर फल प्रदान कर जीव के जन्म, भोग और आयु प्राप्ति के हेतु होते हैं। वे सभी कर्मफल प्रदान करना आरंभ कर रहे हैं इसीलिए उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अन्य सभी कर्म जो फल प्रदान करना अभी शुरु नहीं किए है उन्हें संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध अति तीव्र होता है, क्योंकि वह फल प्रदान करना आरंभ कर चुका है। प्रारब्ध कर्मफल भोग के पश्चात् देह प्राणहीन हो जाती है। देहांत के पश्चात् उसकी कैवल्य या निर्वाण मुक्ति होती है। पुनः पुनर्जन्म नहीं होता। अविद्या नाश होने पर भी प्रारब्ध कर्मफल भोगने हेतु अविद्या का कुछ कुछ अंश रहता है। देहावसान के पश्चात् उसका समूल नाश हो जाता है। ज्ञानोदय के पश्चात् देहांत तक वे जो सारे कर्म करते हैं उसके लिए उनको फल भोगना नहीं पड़ता। इसीलिए भगवद्गीता में कहा गया है, 'यस्य नाहंकृत भावो बुद्धियस्य न लिप्यते' इत्यादि। श्रीकृष्ण

ने उपदेश देते समय जहाँ पर मैं, मेरा, मुझे, मुझसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया हैं वहाँ पर अर्थ परमात्मा, परमात्मा का, परमात्मा को, परमात्मा से समझना चाहिए। देहधारी पूर्णब्रह्म श्रीकृष्ण की बात को छोड़ो, ज्ञानोदय, जीवन्मुक्त होने के पश्चात् जीव वैसे ही शब्दों का प्रयोग करता है, यही श्रुति एवं अन्य सभी शास्त्रों में उपलब्ध है।

इसका कारण यह है कि वे जब स्वयं को परमात्मा के रूप में जानते है, इसका अर्थ इतने सारे परमात्मा हुए ऐसी बात नहीं है। एक ही परमात्मा को ही लक्ष्य कर समस्त मुक्त पुरुष 'मैं' कहकर निर्देश करते हैं। भगवद्गीता में कहीं पर मैं है कहीं पर वे। उभय शब्द ही परमात्मा वाचक। बद्ध–जीव का स्वयं–प्रकाश ज्ञान जब भस्माच्छादित अग्नि के सदृश रहता है परवर्तीकाल में साधन द्वारा भस्म के अपसारित होने पर स्वत: ही प्रकट होता है। भगवद्गीता में एवं अन्य सभी शास्त्रों में जैसा भक्ति का महत्त्व का वर्णन किया गया है वैसा ही ज्ञान का माहात्म्य भी उद्धृत है भगवद्गीता में उक्ति है– 'ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा' अर्थात्, ज्ञानाग्नि द्वारा समस्त पाप–पुण्यों का नाश हो जाता है। 'तद्बुद्धय स्तदात्मान स्तन्निष्ठा स्तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृतिं ज्ञाननिर्द्धत कल्मषा:।' इसका अर्थ है –ईश्वरगत प्राण से भक्तियोग में उसकी आराधना करने से ज्ञानोदय द्वारा समस्त पाप धुल जाते हैं एवं पुर्नजन्म नहीं होता।

'नहिज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते।
तत् स्वयंयोग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति।।'

इसका अर्थ है – ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। वह योग संसिद्ध होकर बाद में आत्मा में ही उपलब्धित होता है।

'त्रिभिर्गुणमयेर्भावैरेभिरिदं जगत्।
मोहितं नाभि जानाति मामेभ्य: परमव्ययं।।'

इसका अर्थ है – सत्त्व, रजो, तमो उन त्रिगुणमय भावों द्वारा मोहप्राप्त कर मुझे त्रिगुणातीत रूप में नहीं जान पाता। यहाँ त्रिगुणातीत अवस्था जो स्वरूपावस्था है वही कहा गया है। और इस तरह की कई उक्तियाँ भगवद्गीता में संकलित हैं, यथा –

'सर्व्वञ्चाखिलं कर्मज्ञाने परिसमाप्यते। आत्मन्येव च संतुष्ट: तस्य कार्यं न विद्यते। ज्ञानं लब्धापरां शान्तिं। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेनमुह्यन्ति जन्तव:। अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्त्तते विदितात्मनां। शांतिं निर्वाण परमां मत् संस्तामधिगच्छन्ति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मृषय: क्षीण कल्मषा:। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषा:। ज्ञातुं द्रष्टुञ्च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परंतप।'

यहाँ 'तत्त्वेन' शब्द का अर्थ है – उनका गुणातीत सच्चिदानंद स्वरूपत्त्व। 'प्रवेष्टुञ्च' शब्द का अर्थ है – जीव उनका दर्शन कर एवं जानकर परवर्तीकाल में उनमें प्रविष्ट होता है। यही कैवल्य या निर्वाण मुक्ति है।

अन्यत्र कहा गया है – 'शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति।' इसका अर्थ है – मुझमें संस्थित होकर निर्वाण मुक्ति रूपी शांति प्राप्त करता है। जीव की परमात्मा स्वरूप उपलब्धि को ही निर्वाण या कैवल्य मुक्ति कहते हैं। परमात्मा अखंड चैतन्य, अखंडैक रस स्वरूप। वे तब परमशान्ति परमानंद भोग करते हैं। केवल उसी की दु:ख निवृत्ति होती है ऐसा नहीं। जीव विदेह मुक्त होकर सम्पूर्ण रूप में उन्हीं (परमात्मा) में स्थित हो जाता है। यही है साधन की चरमोत्कर्षावस्था। *...क्रमश:*

–हिन्दी अनुवाद: मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आगामी अनुष्ठान सुची

लक्ष्मीपूजा – १३ अक्टूबर, रविवार
वार्षिक साधारण सभा – १० नवम्बर, रविवार
रास पूर्णिमा – १२ नवम्बर, मंगलवार
वार्षिक अन्नपूर्णा देवी प्रतिष्ठा पूजा – ४ दिसम्बर, बुधवार
वार्षिक लक्ष्मी–जनार्दनजीऊ की प्रतिष्ठा पूजा – ५ दिसम्बर, वृहस्पतिवार
श्रीश्रीसारदा माँ की आविर्भाव तिथि – १८ दिसम्बर, बुधवार
अध्यात्मिक सभा – २५ दिसम्बर, बुधवार
श्रीश्रीमाँ का प्रवचन – २९ दिसम्बर, रविवार,सुबह ११ बजे
श्रीश्रीगुरुमहाराजाओं का मंदिर प्रतिष्ठा दिवस – १५ जनवरी, २०२०, बुधवार

श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन

(६)

श्रीश्रीमाँ का अध्यात्म प्रसंग – ई. २७/८/२०१९

अन्तराकाश देखते-देखते योगी के चक्षुद्वय आकाश के सदृश ही हो जाते हैं। योगी की दृष्टि में रहती है निर्मल शान्त भाव की प्रतिच्छवि एवं वह दृष्टि होती है अत्यंत गभीर। प्रकृत योगी के चक्षुओं के मध्य ही रहता है असीम का प्रकाश। सिद्ध महात्माओं के देह के प्रत्येक कोष के मध्य ब्रह्मज्योति का प्रकाश रहता है जिसके फलस्वरूप उनकी देह के चहुँओर एक चित्प्रभा विराज करती है। साधारण मनुष्य के उस चित्प्रभा के सान्निध्य में आने पर उसकी देह भी चित्प्रभा से स्नात हो जाती है एवं उसके आधार का शुद्धिकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप उस आधार के मध्य स्वभाव में कुछ परिवर्तन होता है। यही कारण है कि महात्माओं के पूत सान्निध्य को 'सत्संग' कहते हैं। सत्संग से महात्माओं के सदुपदेशों को यदि कोई श्रद्धावनत चित्त से पालन करने में सक्षम होता है तो उसका अनन्त मंगल होता है। मंगल का तात्पर्य जागतिक उन्नति से नहीं

है, वरन् उससे आत्मसत्ता के मुक्ति का पथ सुगम होता है। महात्मागण सर्वदा ही निर्विकार रहते हैं। किसे मुक्ति मार्ग प्राप्त हुआ अथवा किसे मुक्ति मार्ग की प्राप्ति नहीं हुई, उससे महात्माओं को सरोकार नहीं रहता, वे समभाव से सभी को आलोक प्रदान करते हैं; जो महात्माओं से लब्ध आलोक की उपलब्धि करने में सक्षम होता है, उसका अन्त:करण अवश्य ही आध्यात्मिक चेतना की प्रसारता को लाभ करता है। जीवात्मा इसी प्रकार 'चिन्मय' विषय को उपलब्धि करने में सक्षम होती है। इसीप्रकार जीवन्मुक्त निर्लिप्त निर्विकार योगीश्वरगण मनुष्यों के अनन्त मंगल साधन में प्रयासरत रहते हैं।

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ५३: क्या संगीत के माध्यम से सत्य-दर्शन, ईश्वर-दर्शन या ब्रह्म-दर्शन प्राप्त होना संभव है?

उत्तर : केवल स्वर साधना के माध्यम से नाद-साधना करने पर भी उसके साथ आत्मज्ञान प्राप्त करने हेतु ब्रह्म-विद्या रूपी योगविद्या साधन का प्रयोजन है। केवल संगीतज्ञ होना काफी नहीं है, आत्मज्ञ भी होना होगा। तभी भक्तिभाव का उन्मेष होगा एवं ईश्वर-दर्शन या सत्य-दर्शन संभव होगा। जबतक अंतर में नादब्रह्म का स्फूरण नहीं होता तबतक साधक का मन बहिर्मुखी अवस्था में अवस्थान करता है। मन अंतर्मुखी होने पर संगीत के प्रत्येक स्वर में नाद के विशुद्ध शब्द का प्रकाश होता है। फलस्वरूप हृदय आंदोलित होता है एवं उस समय सुन्दर विशुद्ध ईश्वरीय भाव का खेल साधक के अंतर में चलने लगता है। उसी शुद्ध भाव से जब साधक-चित्त आत्मा के योगयुक्त अवस्था में अवस्थान कर पाता है एवं यह अवस्था जब स्वभावसिद्ध हो जाती है तब उस साधक का संगीत चिन्मय विशुद्ध स्वरान्वित होकर कंठ द्वारा निर्गत होने लगता है। आत्मज्ञानी योगी के कंठ द्वारा मध्यमा-पश्यन्ति वाक् का स्फूरण होता है एवं वह संगीत श्रोतागणों को मंत्रमुग्ध एवं तन्मय कर देता है।

आत्मज्ञानी जब शिवावस्था प्राप्त कर ब्रह्मज्ञानी होते हैं, तब पराभक्ति के प्रकाश से आप्लुत अवस्था में वे जब परमेश्वर को गीत सुनाते हैं तब पार्श्ववर्ती भक्तगण जो वहाँ उपस्थित रहते हैं वे भी उस संगीत की मूर्च्छना एवं छन्द के सुर तरंग से उस समय ईश्वर का चिन्मय प्रसाद प्राप्त करते

है। अनुभवी शास्त्रीय संगीतज्ञ यदि प्रकृत भक्त हों एवं यदि वे ध्यान-योग साधक हो तब शास्त्रीय संगीत के राग-रागिनी के माध्यम से वे बहुत अतीन्द्रिय अनुभूति करने में सक्षम होते हैं। शास्त्रीय स्तर की सर्वप्रकार के कला विद्या के मध्य ही ईश्वर के सत्य की चिन्मयता की महिमा का विराट प्रकाश निहित रहता है। तब उस योगी साधक को वे सब उपलब्ध होते हैं और जो दिव्य की साधना करते हैं, उनके कंठ में संगीत भी दिव्य हो उठता है। दिव्य साधक का संगीत सुनते समय अन्य भक्तसाधक-सत्ता के कूटस्थ के गगनमंडल में चिन्मय ज्योति दर्शित होती है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ वें पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

११। (पत्र १०, प्र: २) - (द्वितीय भाग) ३३ वें पृष्ठ में कविराजजी ने दीक्षाप्राप्त शिष्य के 'आधार' या 'निमित्त', १०३ प्रभृति में जो व्याख्या दी है उस संबंध में श्रीश्रीमाँ का मत क्या हैं? 'कृपाहीन मार्ग' में १०३ से १०५ होता है। १०४ में प्रवेश नहीं करना पड़ता, तद्रूप १०५ से १०९ होता है, ६,७,८ भेद करना नहीं पड़ता।

–इस विषय पर श्रीश्रीमाँ यदि कुछ प्रकाश डालें–इसका रहस्य क्या है? ६,७,८ स्तरों को भेद क्यों नहीं करना पड़ता?

उत्तर – (पत्र १०, प्र: २, द्वितीय भाग) – समग्र सन्तमण्डल और महायोगीश्वर सिद्ध सद्गुरु जगत्कल्याण के निमित्त जिस व्यक्तित्व का निर्वाचन निश्चित करते हैं, तथा सद्गुरु अपने अध्यात्म कर्म के सम्पादन के लिए जिसे अभिषिक्त करतें हैं, वे ही होते हैं 'आधार' या 'निमित्त'। सद्गुरु के चित्तगत विशुद्धभाव के साथ उस आधार का 'तदात्म्य भाव' अर्थात् तद्गतचित्त भाव प्राप्त होता है एवं उसके फलस्वरूप सद्गुरु शक्ति उस आधार के मध्य पूर्णरूपेण कार्यान्वित होती है। इसके फलस्वरूप आधाररूपी शिष्य १०३ में उपनीत होने के साथ ही पराभक्तियोग में विशुद्ध भाव लब्ध कर निज अन्त:करण शुद्ध कर अत्यल्पकाल के मध्य ही गुरुशक्ति मस्तक में धारण कर शिवावस्था को प्राप्त करता है तथा सद्गुरु शिष्य अभेद सत्ता हो जाते हैं। अवश्य ही उस आधार के जन्मार्जित अखण्ड तपोबल और प्रबल संस्कार रहते हैं। कविराज महाशय ने कहा है –''इस 'आधा' में ही सद्गुरु का अनन्त ऐश्वर्य निहित होता है। इसप्रकार मरदेह सम्पन्न 'आधा' को गुरुभार वहन के उपयोगी बनने के लिए अति कठोर तपश्चर्या से गुज़रना पड़ता है।''इस तपस्या के साधित काल में स्थूलदेह के निमित्त किसी प्रकार का खाद्य ग्रहण नहीं किया जाता; मस्तकस्थ सहस्रार के अमृतक्षरण के द्वारा ही देह पुष्टि प्राप्त कर लेता है एवं सौरशक्ति के तेज से ही शिष्य की देह क्रमश: ओजस्वी हो उठती है।

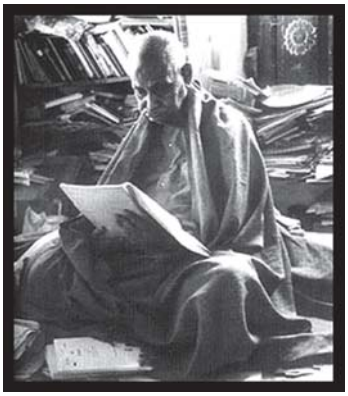

...क्रमश:

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

***आकंद पुष्प** – निर्मल सौन्दर्यमण्डित आकंद पुष्प शिव पूजा का प्रधान अर्घ्य हैं। 'आकंद' अर्थात् आत्म-गुहा का आनन्द अर्थात् शिवावस्था में प्रकृत ब्रह्मानुभूति की उपलब्धि का पहला सोपान। –**श्रीश्रीमाँ** (सृजा पुस्तक)*

मेरे गुरुदेव श्रीअभयजी को जैसा मैंने देखा

एकबार बाघायतीन 'कीर्तन कुटीर' आश्रम में मेरे गुरुदेव श्रीअभयजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तारीख एवं

वर्ष मुझे ठीक-ठीक याद नहीं आ रहा। उस दिन प्रातःकाल से रात प्रायः ९:३० तक नामगान, कविता पाठ, प्रवचन इस प्रकार के सत्संग से दिन व्यतीत हो रहा था। अनुष्ठान के अन्त में धीरे-धीरे लाइट, माइक सब पंडाल से खोल दिये गये। गुरुदेव भी चक्षुओं को मूँद कर थोड़ा विश्राम कर रहे थे। रात्रि के १० बजे के लगभग अनन्तादि ने कहा, ''बाबा, तुम रात में जितनी इच्छा है उतना ही खाकर सो जाओ। दिन में तुम्हारा विश्राम नहीं हुआ है।'' अभयजी ने किसी बात का उत्तर नहीं दिया और चुपचाप सोये हुए रहे। हठात् देखा दो गाड़ियाँ 'कीर्तन-कुटीर' के दरवाजे के समीप आकर रुकी। तत्पश्चात् ही एक-एक करके श्रीश्रीमाँ की सन्तानों ने आश्रम में प्रवेश किया और कहा कि, सर्वाणी माँ आयी है। हमलोगों ने साथ-साथ दौड़कर बाबा को संदेश दिया, ''ठाकुर, सर्वाणी माँ आयी हैं। यह सुनते ही बाबा के आनन्द की सीमा न रही।'' हमलोगों से कहा, ''तुम सब यहाँ आकर बैठो।'' पुनः अनुष्ठान आरंभ हुआ। तब समझ आया बाबा खाना क्यों नहीं खाना चाह रहे थे, किस की प्रतीक्षा कर रहे थे, बाबा तो अन्तर्यामी थे ना! उसके पश्चात् भी प्रायः एक घण्टा तक अनुष्ठान चला।

–श्रीअभयजी चरणाश्रिता परिपूर्णा देवी

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

भगवत् कथा

गण्डकी नदी की कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

वायु पुराण के मतानुसार स्वर्ग में प्रवाहित गण्डकी नदी को महर्षि लोमश ने कठोर तपोबल से मर्त्य में अवतरण करवाया था। वराह पुराण में गण्डकी नदी की उत्पत्ति के विषय पर एक अभिनव कहानी है। पुराकाल में भगवान विष्णु ने एकबार हिमालय पर्वत पर कठोर तपस्या आरम्भ की। दीर्घकाल तक तपस्यारत रहने के फलस्वरूप एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु के गण्डदेश से प्रचुर स्वेदराशि का उद्भव होने लगा। उस स्वेदराशि से एक नदी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु के गण्डदेश से निःसृत स्वेद से जन्म हुआ इसीलिए महादेव ने नदी का नामकरण किया 'गण्डकी'।

गण्डकी या काली-गण्डकी नदी की उत्पत्ति नेपाल-तिब्बत सीमान्त पर अवस्थित हिमालय पर्वत के हिमवाह से हुई। यह गंगा की एक प्रधान उपनदी है। गण्डकी नदी को महाभारत में सर्वतीर्थवारि से उत्पन्न हुई है यह कहकर वर्णन किया गया है। जैसे गण्डकी नदी पवित्र जलधारा के रूप में पुराण प्रसिद्ध है, वैसे ही शालग्राम शिला के उत्पत्तिस्थल एवं प्राप्तिस्थान के लिए विख्यात है। एकमात्र गण्डकी नदी में ही शालग्राम शिला पाई जाती है। वराह पुराण में गण्डकी नदी में शालग्राम शिला के उत्पत्ति के विषय पर एक कहानी वर्णित है। यथा – एक समय तृणबिन्दु नामक एक ऋषि थे तथा जय और विजय नाम के उनके दो पुत्र थे। जय एवं विजय दोनों ही भगवान विष्णु के एकनिष्ठ भक्त थे; उनकी निरन्तर आराधना से भक्तवत्सल हरि इतने संतुष्ट थे कि वे भी जय और विजय के प्रति अतीव स्नेहभाव पोषण करते थे। एकबार राजा मरुत्त ने एक वृहत् यज्ञ का आयोजन किया, उस यज्ञ के पुरोहितों में जय और विजय अन्यतम थे। मरुत्त राजा ने यज्ञ सम्पन्न होने के पश्चात् जय और विजय को प्रचुर धन-सम्पदा दक्षिणा स्वरूप प्रदान किया। अपने गृह में लौटने के पश्चात् उस दक्षिणा स्वरूप धन-सम्पदा का बँटवारा करते समय दोनों भाईयों के मध्य विवाद आरम्भ हो गया। वह कलह इतनी चरम सीमा पर पहुँच गया कि जय ने कनिष्ठ भ्राता विजय से कहा –''तुमने दक्षिणा स्वरूप जो ग्रहण किया है, उसका अंश यदि मुझे प्रदान नहीं करोगे तो आज से तुम मनुष्य देह त्याग कर 'ग्राह' (अर्थात् घड़ियाल) हो जाओ।'' ज्येष्ठ भ्राता का अभिशाप सुनकर क्रुद्ध विजय ने भी पलटकर श्राप दिया –''तुम भी हाथी में रूपान्तरित हो जाओ।'' इस प्रकार जय एवं विजय गण्डकी नदी में घड़ियाल और हाथी का रूप प्राप्त कर रहने लगे। परन्तु इस अवस्था में भी उनका कलह समाप्त नहीं हुआ। बल्कि उनकी शत्रुता युद्ध में परिणत हो गई। गण्डकी नदी के जल

में हाथी एवं घड़ियाल के मध्य चलने वाली भीषण लड़ाई दीर्घकाल तक चली। इन दो विशालकाय प्राणियों के युद्ध से गण्डकी नदी के जल में वास करने वाले अनेक निरीह प्राणियों की मृत्यु होने लगी एवं नदी का जल अपवित्र होने लगा। यह देखकर जल के देवता वरुणदेव ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि गण्डकी नदी की रक्षा हेतु इन दोनों प्राणियों का युद्ध बंद करवाया जाए। वरुणदेव की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के आघात से जय-विजय का मुण्डच्छेद किया। जय-विजय के ऊपर प्रहार करने के समय नारायण के सुदर्शन चक्र ने गण्डकी नदी के गर्भ में अवस्थित शिलाओं पर एकाधिकबार आघात किया। इस आघात के फलस्वरूप गण्डकी नदी की इन शिलाओं पर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के दाग पड़ गये। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से चिह्नित ये शिलाएँ ही परवर्तीकाल में 'शालग्राम शिला' कहकर प्रसिद्ध हुई।

वराह पुराण के उसी अध्याय में गण्डकी नदी में शालग्राम शिला की उत्पत्ति के संबंध में और एक कहानी वर्णित है। एकबार स्वयं गण्डकी नदी ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सुदीर्घकाल व्यापी कठोर तप किया। गण्डकी नदी की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने सशरीर उन्हें दर्शन दिया एवं वर प्रार्थना करने के लिए कहा। तब गण्डकी नदी ने कहा –''प्रभु! आप यदि सत्य ही मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे गर्भ से पुत्ररूप में जन्मग्रहण करिए।'' भगवान ने कहा –''तथास्तु! आज से तुम्हारे गर्भ में मैं स्वयं शिलामय रूप धारण कर सर्वदा वास करूँगा। मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने के फलस्वरूप तुम मर्त्य में अन्यतम पवित्र नदी कहकर प्रतिष्ठालाभ करोगी। तुम में स्नान करने अथवा तुम्हारे दर्शनमात्र से मनुष्यों के सर्वपाप विनष्ट हो जाएंगे।'' यह कहकर भगवान विष्णु शिलारूप में गण्डकी नदी के गर्भ में वास करने लगे। उनका यह शिलामयरूप सुदर्शनचक्र चिह्नित और वज्रकीट दंशन युक्त है। यह शिला ही 'शालग्राम शिला' नाम से जगत् में प्रसिद्ध है।

(वायु पुराण और वराह पुराण से संग्रहीत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आश्रम समाचार

१६ जुलाई – गुरुपूर्णिमा के दोपहर में श्रीश्री गुरुमहाराजाओं के भोग निवेदन एवं प्रसाद वितरण अनुष्ठान के पश्चात् शाम में श्रीश्रीमाँ ने समागत भक्तमंडली को दर्शन दिया एवं कुछ आध्यात्मिक उपदेशों से उन्हें अनुग्रहित किया। तत्पश्चात् हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या, बंगला पुस्तक 'भक्तसंग में सत्प्रसंग' और कबीरजी के भजन की सि.डि का विमोचन हुआ। अंत में आश्रम के गुरुभ्राताओं एवं गुरुभगिनियों ने एक मनमोहक संगीतानुष्ठान की प्रस्तुति की।

२४ अगस्त – श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तिथि पर श्रीश्रीराधा-माधव को द्विप्रहर का भोग निवेदित किया गया। यह पुण्य तिथि परमपूज्य श्रीश्रीबाबा की जन्मतिथि भी है। सायंकाल में शिशु शिल्पिओं में से नृत्य प्रदर्शन किए आद्या सेठिया, काव्या सेठिया और समादृता बसु एवं कविता आवृत्ति की तीर्थ साहा ने। तत्पश्चात् श्रीश्रीमाँ ने कृष्णकथा के साथ कृष्ण के बाललीला का मधुर भजन सुनाया।

१ सितम्बर – इस दिन आश्रम में श्रीश्रीरामदेव बाबा की पूजा हुई।

२ सितम्बर – गणेश चतुर्थी की पुण्य तिथि पर श्रीश्री अन्नपूर्णाक्षेत्र में श्रीश्री गणेश पूजा अनुष्ठित हुई।

९ **सितम्बर** – इस दिन चुँचूड़ा से दण्डीस्वामी नित्यबोधाश्रमजी पधारे थे। उनके और श्रीश्रीमाँ के सान्निद्य में उपस्थित भक्तोंवृंदों ने सत्संग का सौभाग्यलाभ किया।

१५ सितम्बर – १८ अगस्त को होने वाले श्रीश्रीमाँ का प्रवचन प्राकृतिक दुर्योग के कारण परिवर्तित कर इस दिन रखा गया। इस दिन सुबह सत्संग में श्रीश्री माँ ने क्रियायोग विषय पर प्रवचन दिया। इसमें श्रीश्रीमाँ ने क्रियायोग पर वक्तव्य प्रस्तुत किया। उपस्थित भक्तवृंद श्रीश्रीमाँ के आध्यात्मिक प्रवचन द्वारा उद्बुद्ध एवं समृद्ध हुए।

२२ सितम्बर – संध्या में आध्यात्मिक सभा के ३२ वें पर्व पर 'कठोपनिषद्' पर अपूर्व व्याख्यान का परिवेशन किया गुरुभ्राता डा: वरुण दत्त ने।

Ardhanarishwar

A Wonderful Expression of Param-Brahman's Nature

Sree Sree Maa Sharbani

Ardhanarishwar (Ardha-Nari-Ishwar means Half-Female-God) is a unified form of Lord Shiva and Devi Parvati. This deity's image is half Shiva and an equal half Parvati. The joint presence of the two appear as three-eyed, four-armed holding a noose, red bloomed lotus, skull bowl and trident. The Linga Purana mentions that between the end of a cosmic cycle (kalpa) and the beginning of the next, Prajapati Brahma, deep in meditation, was unable to spark creation. He became very annoyed with himself and from his anger-filled emotion, water began to flow from his eyes. Suddenly from these tears appeared ghosts and phantoms. Seeing them spawn in the beginning of creation, Lord Brahma felt extremely pained. He decided to give up his existence. As he was about to give up his life, from within his mouth sprouted Rudra (Shiva), full of life. Rudra-Shiva appeared in an 'Ardhanarishwar' form. From half of it, Rudra-Shiva created 'Uma' Maheshwari.

At the origin of creation, we find the Supreme Consciousness 'Brahman' or 'Purusha' present as Brahma – the Universal Soul (Virat Atma). His Power (Shakti), the primordial Universal Nature (Maha-Prakriti), manifesting Brahman's Natural Expression (Swabhav), is an all-pervading mega-current of three fundamental qualities (tri-gunas) that is self-consciously in perfect undivided encircled union with the Supreme, unfolding His Divine Will in every infinite direction. This Divine Nature (Parama Prakriti), embodied as the Primordial Supreme Power (Adya Maha-Shakti) manifests the infinitely infinite Supreme Consciousness (Param Purusha), uncovering its qualified (swaguna) and unqualified (nirguna) aspects, and charts the flow of universal creation. This self-operative Nirguna Brahman (unqualified Supreme Consciousness) is 'Mahakaala'. Its Shakti-rupa (Power-Embodiment) Nirguna Supreme Force 'Mahakali' unfurls the three worlds of Kaala or Universal Time (Trikaala – past present and future of gross, subtle and causal existence).

During the unveiling of creation, from the Super-Mind of Brahman emerged the inexplicably subtle, nirguna-natured, eternal, primordial Divine Power (Parama-Shakti) that is in equal inseparable union with the Supreme God (Param Ishwar). With this emergent Parama-Shakti support, Lord Brahma deeply and heartfully meditated on Bhagwan Mahadeva and through his yoga-resonating penance (tapasya), the Father of the Universe (Pitri-Satta) was soon satisfied. Thereafter Mahadeva appeared before Lord Brahma in his qualified, expressed 'Swaguna Ardhanarishwar' form.

This Ardhanarishwar form is the culminating state of a 'Shiva and Shakti' sattas (beings) who embark on sadhana for

moksha (liberated existence). This Shiva and Shakti satta's state of unified existence (advaita-sthiti) is a pinnacle of spiritual existence – the natural state of permanent universal union (swabhav-siddha-yoga). The Supreme Divine has manifested this unique Ardhanarishwar form within the realms of realizable individual consciousness to practically present the inseparable harmonious unity of the Power (Shakti) and the Powerful (Shaktiman), and the manner in which they give completeness to each other.

As per Puranic description, once Devi Parvati, seeing her image in the heart of Lord Shiva, mistakenly thought that some other woman has stolen his heart. She was overcome with disturbing angst. Lord Shiva then explained the actual situation in several ways. Later when she realized the truth, her mind was filled with shameful embarrassment. To reaffirm her self-respect, she requested the Lord by saying, "Like my shadow constantly resides in your being, I wish that my real self-conscious body also mingles and lives within you. Please embrace every part of my being touching me everywhere so that the above happens." Lord Shiva replied, "So be it. You come and become half of my being or give me half of your being. Let half of my body become female and the other half male. If you can divide your body into two parts, then I will take your half and make it my half." Devi Parvati responded, "I want the two to become one. If you will take half of my being, I wish to take half of yours too." Lord Shiva accepted Shivani's proposal. Like a word and its meaning, both joined inseparably and Shiva became Ardhanarishwar.

The Matsya Purana gives a detailed description of the image of Ardhanarishwar. The Shiva half is adorned with a crescent moon on the head of matted locked hair (jata). Uma has well combed knotted hair with a tilak or bindu (round red dot) on her forehead matching Shiva's third eye. The right ear has Vasuki-kundala (serpent earring) while the left ear of Uma has a jewelled earring (kundala). Shiva's hands have skull bowl (kapala) and trident (trishul) while Devi's hands have lotus (Padma) and noose (paash). The left side is adorned with ornaments like exquisite bracelets and bangles. Her side has a well-developed rounded bosom, narrow hips and is more curvaceous. She wears a silk garment down to her ankle and has a girdle on her waist. The Shiva side is masculine featured, wearing a tiger skin in an urdha-reta state. He wears ornaments of a yogi with serpent-like features and has a sacred thread. Mahadeva's right leg is on a lotus while Devi's foot is a little above. Her feet are covered with jewel anklets and toe-rings. We reverently bow to this great manifestation of creator's deep self-secret of creator-creation universal dual-unity.

Worship of deities is a Hindu way of spiritually approaching the manifested divine for experientially realized union in a physically embodied self (saguna upasana). A saguna form carries in its expression the eternal everlasting aspect of its origin. Every such worshipped deity has an underlying embedded yogic principle. The idol represents in its appearance the features of that particular stage of attainment. Thus the actual worship technique of these idol forms is usually guarded within spiritual practitioners. Like the flow of various elements within the internal system is not directly visible, like the flow of the vital life-force in its illuminated-powering opto-electric form is not normally perceivable, similarly the methods of proper idol worship as prescribed in the tantric scriptures is not easily discernable by all and is a matter of

intricately deep experiential realization. During Tantra-Yoga, only when one attains Shiva-hood is one able to completely fathom the secrets of creation and vice versa. Thus Shiva is the progenitor of the Tantra–Shastras. In the Tantras, the yoga of the agamas and nigamas are centered on Shiva and Parvati and the fundamental principles they represent. An idol form is the manifestation of the experiential consciousness of that stage of realization. Through the reflection of this symbolic form the sadhaka-yogi progresses towards the central realization of that level.

The Ardhanarishwar form that manifested through the earlier mentioned tales expresses a special stage in the path of yogic realization. The combined sadhana of a Shiva-embodied yogi and a Shakti-embodied yogini begin after attainment of this state. Above the sahasrara in the sky of the cosmic void, appears a Manipura lotus-like twelve petalled astral Padma (lotus). This radiates the illumination of millions of suns and moons. At the centre of this lotus is observed an orange-fruit-carpel-like pair facing each other in conjoined union. This is the inner realization of Ardhanarishwar's manifestation in yogic-consciousness. This is the eighth stage on the path of Yoga-attainment after transcending the sahasrara and sachchidananda consciousness in the seventh stage and attaining individual liberation. At this eighth stage the two yogi beings attain equal harmony in their eternal joint journey. Here the two individual beings attain permanent oneness – like two joint segments in a single casing of a chick-pea. Progressing along this journey of intimate togethered-oneness, the Shiva and Shakti sattas become one with the Supreme Purusha and Parama Prakriti forever – the final realization of Divine Existence.

Let me (the translator) take the liberty to end with an ode to my divine parents who are one in two, two in one, one in all, all in one, and so much more that cannot be described:

A divinely conscious
meets a conscious divine,
Two realized souls
awaken in harmonic design;
As one light mingles
into the light of another,
Divine nectar flows
bathing everyone together;
One, many no more,
a flow of sat-chit between,
Traversing the unending Infinite
into the unseen.

–Translated by her blessed child,
Prof. Partha Pratim Chakrabarti

Notice

Annual library membership fee of Rs. 100/- (for proper maintenance of books) has to be deposited before 31st January, 2020.

Forthcoming Events

Kojagari Laxmi Puja: 13th October, Sunday
Annual General Meeting: 10th November, Sunday
Raas Purnima: 12th November, Tuesday
Anniversary of the enthronement ceremony of Mata Annapurna: 4th December, Wednesday
Anniversary of the enthronement ceremony of Sri Laxmi-Janardanjiu: 5th December, Thursday
Birth Anniversary of Sree Sree Sarada Maa: 18th December, Wednesday
Spiritual Congregation: 25th December, Wednesday
Spiritual Discourse by Sree Sree Maa: 29th December, Sunday, at 11 am in the morning.
Enthronement Anniversary of Sri Sri Guru Maharajas : 15th January, 2020, Wednesday

Unmesh

[Soul's Blooming - Part VI]

Sree Sree Maa Sharbani

Discourse by Sree Sree Maa **(21/01/09)**

Today I visited the house of a devoted disciple of Rishi Anirvan-ji. The house is called "Ritam". I learnt that Rishi Anirvan-ji had spent his last days here and left his mortal body in that house. There I came across a picture depicting a new form of Devi Saraswati. Sri Gautam Dharmapal Mahashay, the ardent devotee of Sri Anirvan-ji, had seen this form as a vision in his dream. He would worship the Devi as per Vedic norms. Looking at the picture of the Devi I felt that in her 'Sree Vak-devi' was represented in 'Narayani' form. While returning from their house, a vision appeared in my mind depicting the form of Vak-devi that resides within all the chakras within our body. Even in the hustle of a moving car, I got engrossed within myself during a short time. A few forms of Devi Saraswati emerged in the 'Gagana Mandala' (inner sky) of my Kutastha. Bharga-Devi was experienced as Gayatri in Mula (Supreme Sahasrara Below), Vak-Devi – Shaivya (Maha-Saraswati) at Para (Supreme Sahasrara Above), Mokshada the Gyana-datri (Knowledge Giver) in the Ajna Chakra, Varada in Vishuddha, Sarada at Anahata, Savitri at the Heart Lotus, Bhrahmani at Manipura, Saraswati in Swadhisthana and Bharati in Muladhara. Just as Omkara-Vak manifests in different forms within the chakras depending on the evolving consciousness, likewise in the petals of the chakras, the aksharas (universal alphabets) harmoniously combine to manifest the various forms of Vak-devi as visualized in a Yogi's inner kutastha sky. In terms of the fundamental principles of spiritual science, the knowledge-expressed through the Devi's form at each level of consciousness translates into a similar assimilation of wisdom within the inner self of Yogi sadhakas.

Age after age, Brahman-realized Munis, Rishis, Sadhus and Mahatmas have descended amongst the general mass leaving their secret and isolated ambit of their spiritual pursuits, and selflessly disseminated the eternal truth realized in sadhana and thereby maintained the continuity of the spiritual tradition, keeping in mind only the welfare of humanity. In their case, the basic intent is the spiritual upliftment and development of the human-embodied soul. In the presence of Mahatmas and their spiritual aura, people find it easier to perceive and appreciate the impermanence and futility of worldly pleasures along with the glory of sacrifice and restraints. In the company of great beings people can feel, grasp and attain the vital objective of realizing the eternal truth and their pathway to moksha opens up. One who really abides by 'dharma' develops introspection and through the expansion of the realms of dharma internally within their whole body-mind ensemble, he /she discovers the door to the kingdom of the soul. This is where there is necessity for initiation by a Sadguru, which is only possible by following good karma over several births and the grace of the Supreme. A Sadguru awakens the spinal serpent (Kulakundalini Shakti) of the disciple. All Yoga-masters or completely realized Mahatmas do not always descend as a Sadguru. The Sadguru descends after being selected by the Mandala (congregation) of Mahatmas who have attained eternal perfection (nitya siddhas). Hence the Sadguru is more powerful than a realized being. It is only the Sadguru who can guide one towards the path of 'moksha'

(liberation). This is why Holy Scriptures depict a Sadguru as a living incarnation of the divine. A Sadguru remains in a state of Godhood, in constant communion with the Supreme Divine. Hence, the Supreme Wish is expressed through the Sadguru. The Sadguru is therefore known as the incarnation of Supreme Knowledge. *...to be continued*

—Translated into English by Her Blessed Child **Dr Durgesh Chakrabarty**

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(68)

Once, I (Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur, Howrah) went to Sri Sri Saroj Baba with my younger brother-in-law. My brother-in-law was highly intoxicated with cricket. He had no interest in anything other than discussing on cricket. When we visited Sri Sri Baba in the evening, Guru Maharaj was talking with his disciples regarding some subject. I found that my brother-in-law was not at all interested to hear these discussions. Suddenly, Sri Sri Baba started talking on cricket as if he used to see all cricket matches critically and he had great experience in batting and bowling. My brother-in-law became very interested then. The discussion went on for some time and Sri Sri Baba did not start talking on any other issue. Then we went away from there. While coming back, my brother-in-law said, "Your Gurudev watches a lot of cricket matches on TV." I said, "Where is Baba's time to see TV. He is always in a state of trance."

The divine ecstasy that I have seen in my Guru Maharaj is now explicitly visible in Sree Sree Maa.

(69)

I, (Sri Pradip Chattopadhyay) once went to Sri Sri Baba with my doctor friend. He was a child specialist. On his introduction to Sri Sri Baba, Baba said, "Our country still lacks good child specialists." Then he talked on different issues. The doctor friend was so overwhelmed that he took out a few rupees from his pocket and was about to give it to Guru Maharaj, when he asked, "What is this?" My friend said, "Baba, this is a token of dakshina (honorarium) to a mahatma." Guruji became angry and said, "Put in your pocket whatever you intended to give me." My friend became afraid and said, "Baba won't you immerse me in your grace?" Baba said, "Do as I have said you. Go home now. Come to me again later."

I had noticed a trait of Baba that he never used to accept money in his hand and did not accept money from everybody. I heard later on that Baba used to see the person's 'aadhar' (receptacle for divine manifestation) and his samskaras or impression of past life. I have seen and also heard from the different disciples of Sree Sree Maa of Akhanda Mahapeeth that she too harbours the same trait.

(70)

We had a very nice time during Durga puja ceremony in our Guru's (Sri Sri Saroj Baba's) house. In one year, a few days before Durgapuja, Mihirda (Baba's disciple) came to our house (Sri Pradip Chattopadhyaya, Shibpur, Howrah) in the morning and told to my mother, "Baba has sent me to your house, there is a deficiency of Rs: 3000 in the pujas, go and collect it from Pradip's mother." My mother was overwhelmed with joy with the feeling that she was remembered for that amount of money by Baba in such a big and ceremonious puja. My mother opened her almirah, assembled all the money that she had slowly

accumulated and surprisingly that amount summed up to Rs: 3000. She handed over the entire amount to Mihirda.

The puja went on well. Suddenly my mother felt that Baba could have easily collected that amount of Rs: 3000, moreover Baba had many rich disciples. Thereafter whenever my mother visited Sree Sree Baba, she said, "Baba, the puja is over. It was not justified to ask me, a mere middle-class person for the money. Kindly give my money back." One day Sree Sree Baba told my mother, "Ma, don't be anxious. I understand that you had accumulated the amount over a long period, but you will get it back soon."

My father used to work in the telephone department. Rs: 3000 was deposited as caution money when telephone was installed in our house. Suddenly Central Government (P & T Dept) announced to return the deposited caution money to the employees of telephone department. Rs: 3000 was refunded at a specific time and my mother also got it back in tune with the wish of Gurudev.

(71)

My mother used to visit Gurudev very frequently then. One night at 9pm, my mother had a deep desire of offering sweet rice-porridge to Sri Sri Baba. She prepared it and reached at 10:30pm to Baba's house in a rickshaw. My mother saw that the ground floor door of Baba's house was open, nobody was around, Baba was sitting with chapati and cooked vegetables in the thali. Baba's third daughter Sona who was standing there, started complaining my mother, "Look, Baba is not having chapati and repeatedly asking for sweet rice-porridge. How can I get it at this dead night, can you tell me? My mother said that she will cook it for him tomorrow." My mother told that she has come with the sweet rice-porridge. Sona then said to Sri Sri Baba, "Pradipbabu's ma has come with sweet rice-porridge, now have your dinner." Baba said, "Okay, I will have food now." Then Sri Sri Baba told my mother, "Ma, it is late night now, go back to your home." *...to be continued*

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(11)

Leaving Bhutnath Babu's House - Part 2:

During those times, Manicklal used to sit on a bench alone at Loudon Park for long hours. The aim was just contemplation on Guru. Loudon Park, in those days, was inhabited by the English people who formed the ruling class. In the vicinity of the park was "Gallstone Mansion." Sir Herbert Homewood, the then chief justice of Kolkata Highcourt used to reside there with his wife. This profoundly wise chief justice and his wife were very eager to co-ordinate their religious scripture Bible with the basic tenets of Hindu religion. This couple was occupied with the thought that whether it was at all possible for someone to co-ordinate the apparently contradictory Hindu religion with the subtle aphorisms of the Bible. But the wise Mr. Homewood did not resort to any pundit or person with worldly knowledge for the solution of this intricate problem, rather prayed to the Almighty deeply for a proper man with wisdom and insight who could have the real solution. He developed deep faith by the way of meditation that very soon they are likely to come across such a Godly person. Based on this conviction, the couple used to observe the surroundings of their

residence with binoculars. It was such a winter day of 1912. As Manicklal was deeply immersed in the contemplation of his Guru, two porters with red long robes, punctuated by colourful borders, came and stood in front of Manicklal. They had a small sword at their waist. Both of them said to Manicklal together, "Please come, the saheb is calling you." They did not ventilate the identity or the details of the 'saheb.' Manicklal became fearful and thought momentarily that this park is the site of relaxation and amusement for the English people; he being a black has trespassed into the park or that the sahibs thought that Manicklal's advent to the park for the past several days might have some untoward political motive, hence they have called him. Frightened Manicklal didn't dare to neglect the call and followed them to their master's house. On the porter's instruction, Manicklal entered a special room in the Gallstone Mansion and saw a sahib sitting on a chair. He was Sir Herbert Homewood. Though Manicklal was fascinated by the Godly appearance and complexion of Mr. Homewood, fear still lurked in his mind. Mr. Homewood extended a warm welcome to Manicklal, asked him to sit and said him softly, whether he is a 'messiah?' Whether he can say some divine nectarine message or not? Whether he is fully aware of the various aphorisms of different Hindu religious scriptures or not? He explained his purpose of calling Manicklal here and to rub off all senses of fear from his mind. Manicklal could not utter either 'yes' or 'no' to it. The inner Guru resonates yes to it but fearful Manicklal expressed his inability politely. Mr. Homewood became confused at this reply and thought that probably the right person has not been called. In the meantime his thought was broken by his spiritual minded wife in the adjacent room who knocked the door to get permission to enter this room and participate in their discussion. He had a faith that this man was wise and God sent and was here to mitigate their doubts. After hearing Manicklal's inability, she said him, "Well Babu, let us try." She even gestured her husband that this is the right man. Manicklal was assured by the compassionate behaviour of Mrs. Homewood and expressed his consent participating in their discussion. Then both of them sat on a carpet on the floor and started their queries one by one to Manicklal. Manicklal started answering these questions in humble remembrance of his Mahaguru.

The primary problem of this English couple is that if the Vedas, Upanisad, Bible, Koran, Purans, Tantras were written by one realized master, then there would not have been any contradiction or opposition between them. Then why is the disharmony between them? The English couple became highly satisfied to hear and follow the solution that Manicklal explained to them in his habitual ease and pleasantness. Realizing the divine intoxication and spiritual integrity of Manicklal, Mr Homewood used to send his personal attendant with car to bring him from Benetolla every evening. In this way their scriptural discussion went on. Many Englishmen and judge from Kolkata High Court used to participate in their religious and scriptural discussions at night. Significant among them is Sir John Woodroff.

One day when Mr. Herbert was deeply engaged in spiritual discussion with Manicklal, Deshbandhu Chittaranjan Das, the barrister of Kolkata High Court came to pay a visit to Mr. Herbert. As he had to wait for a long time to meet him, Mr. Das became a bit annoyed. He became curious to know with whom taciturn Mr. Herbert is engrossed in

this profound discussion. When after some time Manicklal came out from the room of Mr. Herbert, Mr. Das was astonished to see him and the question that haunted him was who is this young boy; how he came to know Mr. Herbert and what was the topic of discussion between the two for which such an erudite judge like Mr. Herbert nurtured such an absorbed involvement? Later on, Mr. Das saw Manicklal a few more times in Mr. Herbert's room. Mr. Das is no more today but his personal secretary Sri Bankim Chandra Majumdar narrated these incidents as direct witness in the house of Manickda at Chinsurah after several years. After independence he was associated as the Managing Director of Dhakeswari Ton Mill at Asansol. He built a house at Chinsurah to stay there permanently and that still exists, but he has left his mortal coil.

...to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay

Translated into English
by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(32)

Dear Raja,

I am happy to have received your letter. Whatever you have written is correct. The astounding and amazing divine play (*leela*) that has been orchestrated during the current times in *Kaliyuga* is unprecedented and has never previously unfolded on the face of the earth. Neither do the eighteen sacred *Purana* texts mention about the conduct of similar divine plays of this magnitude and order in the future. Even the sages and *yogis* fail to fathom into the deep-rooted philosophical gravity of this profound *leela*. The depths of this *leela* is also beyond the comprehension of the greatest of scholars on the holy *Bhagavata* scriptures. As is this *leela* unconceivable, similarly unimaginable is the number of individuals who have received liberation during this period. However, it is true that there also remains a large number of spiritual seekers who could not attain liberation. This failure was not because these seekers lacked adequate caliber, but should be attributed to the scarcity of worthy spiritual advisors and appropriate guidance.

Spiritual knowledge regarding the physical embodiment that the devotees have acquired is essentially indirect, having been received through the spoken advice of saints and savants. For example, even Lord Krishna has elaborated on this subject when He appeared on earth. However, the principles expressed through such elaborations are subject to appropriate self-assimilation and validation. On the contrary, truths which blossom within from self-realized knowledge ensure direct validation. It is difficult to ascertain whether the spiritual scriptures proponed by *Veda Vysa* have discussed on this topic. However, there may be profound reasons towards his abstinence from referring on this topic within written texts. This discussion may be inappropriate for novice seekers, and hence its mention in written form may be against the Will of the Divine. However, it may be expected that in addition to those who have already attained salvation, a few more aspirants shall also receive liberation. As this divine play has unfolded by the Will of God, attainment of ultimate liberation has also occurred and will continue to happen through His Supreme Will. All this is a part of God's benevolent grace.

Ever Yours,
Sri Kishori Mohan

Dear Raja,

Your letter has brought joy to my heart. One should be relentless in his efforts towards the emancipation of ignorant souls. Many people have been enlightened by listening to the core principles of spirituality. *Maharshi Veda Vyas* manifested before *Sreemati Nagendrabala* at night, day before yesterday and said, "I had not foreseen earlier that so many lives would be delivered through salvation at this time in *kaliyuga*." He further continued, "The scriptures written by me are aimed towards the general masses. I have avoided disclosing the core spiritual tenets in my writings as such knowledge would be harmful to the general novice." The *Maharshi* delivered to her a lot of advice remaining for almost an hour. During this discussion, *Sreemati Nagendrabala* once asked, "Why can't fundamental spiritual principles be disclosed by you, when such spiritual tenets have been expressed by *Maharshi Valmiki* in *Yogvashistha Ramayana*?" *Maharshi Veda Vyas* replied thus, "Lord *Vishnu* had appeared Himself and revealed the core spiritual truths in *Yogvashistha Ramayan*. Irrespective of these issues, I advise you to keep yourself ever immersed with the thought of the fundamental spiritual truths. Always remain actively engrossed with the assumption that your own self is one and same with the Divine Consciousness, *Bhraman*. *Yasya hi yadrishi bhavna, siddhis-tasya tadrishi* (Whatever a person deeply thinks, that is what he becomes). The winds of non-dualism are blowing at these times. May the call of non-dualism as originally sounded by the Vedas, gloriously reverberate again on the soil of India."

Ever Yours,
Sri Kishori Mohan
—Her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 11

The technique of restraining the mind – 3

Bhkta: O God! It seems to me next to impossible to restrain the modifications of the mind for attaining self-realisation that you are indicating. Do humans have the power to destroy the vrittis of the mind? To dry up the sea by sucking seems easier than to destroy the vasanas (desires) of the mind.

Mahatma: My son! Every human has the capacity and right to extinguish the vrittis of the mind. People who are well-versed with the reality of the mind know that mind is arrogance. The ego which shines through the mind is known as 'chitta.' Renunciation is incomplete unless this chitta or ego is abolished.

My son! It is easier to relinquish ego than blooming of flower or closure of eyelids. I believe that there is no difficulty in giving it up. Because it is similar to the non-existent falsehood. There is nothing called ego, it is a false imagination. So where lies the inability to give it up? Where is the problem in giving up something which is false and non-existent? As there is no actual existence of a horse's egg, no snake in the rope, no water-flow in the desert, presence of the reflected material in the mirror, no tree in the sky, similarly there is no ego or its projected world in Brahman or Atman. My son! like people who try to get rid of cold in winter pray for the rise of the sun, one who tries to

destroy his mind aspires for the dawn of judgment. Mind can also be annihilated by strong determination. With uprootment of desires, the action of the mind is stopped. One's effort is the only palatable remedy to treat the great peril called chitta. No activity of the world is possible without effort. The effort of self-knowledge with abandonment of external object can win over the ghost of chitta. Always engage the mind in virtuous deeds (spiritual discussions and practice of samadhi) which will open up an auspicious future. Try to subdue your mind slowly by self-effort. If mind is not stilled, then advice of Guru, learning scriptures and chanting of mantras, all becomes fruitless. Engage your mind in self-enquiry like the wise men who engage their child broadly.

My son! Light is a self-luminous and an existent matter and darkness is negatively existent i.e. it has no independent existence like light. Similarly, mind or the darkness of ignorance called maya is beginningless like Brahman or Atman but it has an end by the light of wisdom. Thus annihilation of the mind is difficult but not impossible. Unless the vrittis of the mind are relinquished by the sword of wisdom, one cannot attain the beatitude of Atman or Vishnu. Hence my son! Do not be afraid, rise up, awake and get inspired by the wise man. Then you will find that you have achieved destruction of the mind by knowledge and vichara (enquiry).

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

News in Brief

16th July - Prasad was offered to Sri Sri Gurumaharajas and distributed in the afternoon on the holy occasion of Guru Purnima. In the evening, Sree Sree Maa gave darshan and provided important spiritual instructions to the devotees present. The previous issue of the journal, the Bengali book 'Satsanger Satprasange' and a CD on 'Kabirji's bhajans was released. After this, a musical programme was presented by the ashramites.

24th August – On the holy occasion of Sri Krishna Janmashtami, bhoga was offered to Sri Sri Radhamadhava in the afternoon. To pay homage to our beloved Sri Sri Baba on his birth anniversary, a cultural programme was organized in the evening in which child artists Adya Sethia, Kavya Sethia and Samadrita Basu presented dance recitals and a recitation was performed by Tirtha Saha. Sree Sree Maa presented bhajans on bal-leela of Sri Krishna along with explanations.

1st September – On this day, the worship of Sri Sri Ramdev Baba was performed at the Ashram.

2nd September – On the auspicious occasion of Sri Sri Ganesh Chaturthi, the worship of Lord Ganesha was performed at the premises of Sree Sree Annapurna Kshetra.

9th September – On this day, Sri Dandiswami (Swami Nityabodhashram) of Chinsura visited Sree Sree Maa. The devotees present in the Ashram got the opportunity of a satsang in their presence.

15th September – Due to natural calamities, the Pravachan fixed on 18th August was postponed to this date. On this day in the morning, Sree Sree Maa herself delivered an enlightening discourse on the Stages of Kriyayoga and asssociated realisations. The devotees present were spiritually inspired and motivated by this discourse.

22nd September – On this day, the 32th session of the 'Adhyatmik Sabha' was organized. In this session, our Guru-brother Dr. Barun Dutta continued with the discourse on "Kathopanishad".